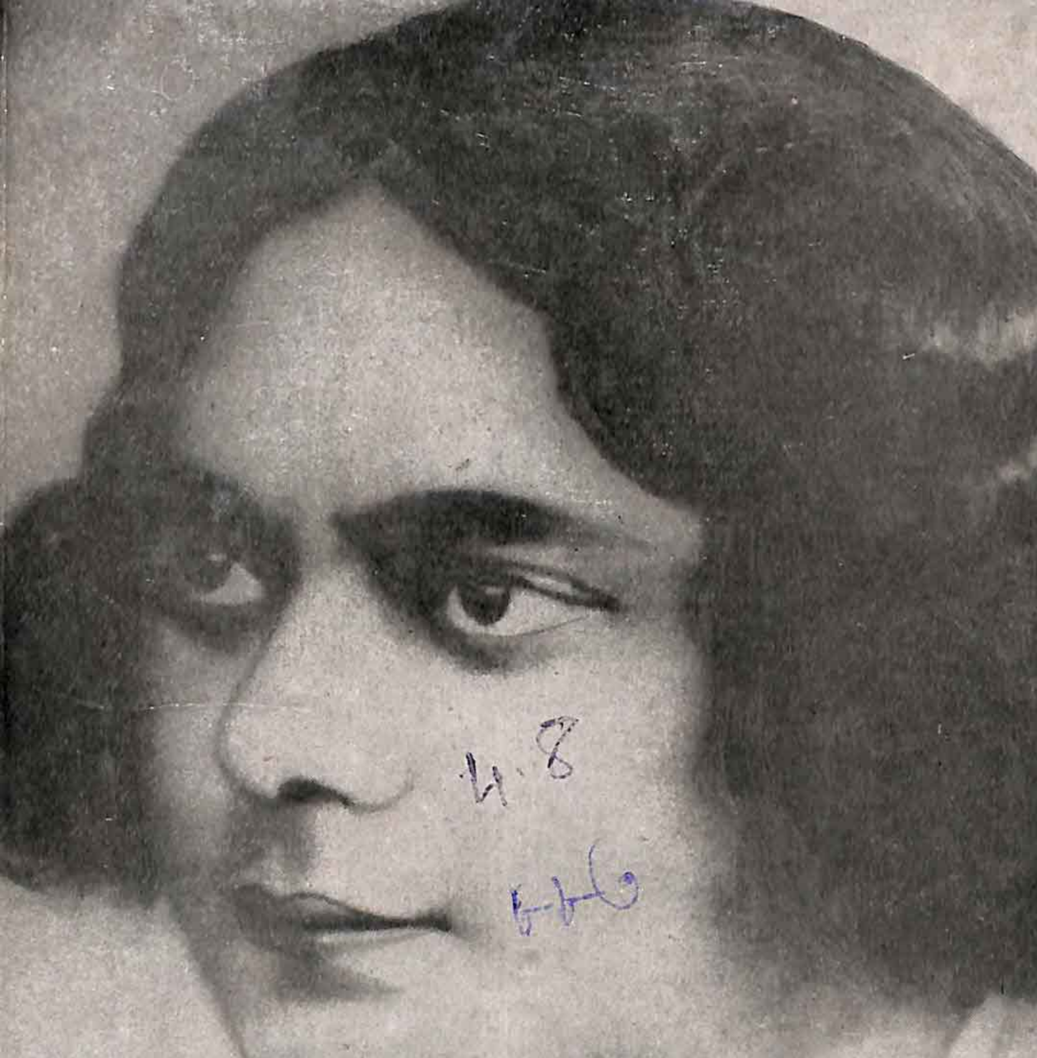


অগ্নিতাপস নজরুল

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্নিতাপস নজরুল

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডল এ্যাণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

অগ্নিতাপস নজরুল
Agni-Tapas Nazrul
(Complete Biography of
Kazi Nazrul Islam)
Shantimoy Bandyopadhyay

প্রথম প্রকাশ :
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫
২৫শে মে ১৯৮৮

প্রকাশক :
সুধীর কুমার মণ্ডল
মণ্ডল এ্যাণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ :
কুমারঅজিত

আলোকচিত্র শিল্পী :
সঞ্জয় ধর
শিবানী ফটোগ্রাফিকস্

মুদ্রণ :
স্বর্ণলতা ঘোষ
ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য : পনেরো টাকা

উৎসর্গ

আমার সাংবাদিক জীবনের পথস্রষ্টা
নির্ভীক সাংবাদিক
শিবসনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্যরঞ্জন কর্মকার
অগ্রজপ্রতিমেষু

॥ আমার কৈফিয়ৎ ॥

এক একটা সময় আসে, যখন মনের গভীরে লালিত স্বপ্ন সফল হয়, অন্ততঃ আমার তা হয়েছে 'অগ্নিতাপস নজরুল' প্রকাশ করতে পেরে। প্রথম যৌবনে কিশোরদের জন্য লেখা আমার বই 'বিদ্রোহী নজরুল' একদা জনপ্রিয় হয়েছিল। পরিণত এই বয়সে আরো অনেক তথ্য ও বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে লেখা 'অগ্নিতাপস নজরুল' বিদগ্ধ পাঠকের ভালো লাগলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থকতা পাবে।

আমি ঐতিহাসিক বা কৃতী সাহিত্যিক নই। নজরুল পরিবারের সঙ্গে আবাল্যসম্পর্ক আমার, নজরুল একাডেমীর জন্মলগ্ন থেকেই যতটুকু পেরেছি জড়িয়ে আছি আর তাই, সংগতকারণেই আমার মনে হয়েছে প্রিয় কবির সমগ্র জীবন ও চিন্তাধারা নিয়ে কিছু লিখবো, তারই চেষ্টা করেছি মাত্র। চেয়েছি গালগল্প বাদ দিয়ে অগ্নিতাপসের মানসিকতা, রবীন্দ্র-শাসিত সাহিত্যগগনে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সত্যকে প্রকাশ করতে, কতটা সফল হয়েছি সে বিচারের দায়িত্ব থাকলো সুধী পাঠক সমাজ ও গবেষকদের হাতে। আমি জানি অল্পবিদ্যায় যা লিখেছি তা ভয়ংকরী হয়তো হয় নি, তবুও বিশ্বাস করি সার্বিক সহযোগিতায় পরবর্তী সংস্করণ আরো তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলতে পারব।

'অগ্নিতাপস নজরুল' লিখতে লিখতেই আমার পরমবন্ধু, স্বনামধন্য প্রকাশক শঙ্কর মণ্ডলকে দেখিয়েছিলাম এবং তক্ষুণি পাণ্ডুলিপি পছন্দ করে যেভাবে গভীর আগ্রহ আর ভালবাসা নিয়ে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে বইটি প্রকাশ করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি বললেও কম বলা হবে। তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতিমধুর সম্পর্ক এতে আরো নিবিড় হোল। শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু, পিতৃতুল্য শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল তাঁর আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছায় আমাকে ভরিয়ে দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

'নজরুল একাডেমী'র সাধারণ সম্পাদক, কবির ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার সতীর্থ কাজী রেজাউল করিম, নজরুল একাডেমীর সকল সদস্য, ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কসের তরুণ ঘোষ ও কর্মীরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, তা চিরকাল মনে থাকবে। কলকাতার বিশিষ্ট আলোকচিত্রশিল্পী নজরুল অনুরাগী সঞ্জয় ধর তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসায় এই বই-এ ব্যবহৃত যাবতীয় ফটো নিঃসর্তে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—কখনো ভুলবো না এই আন্তরিকতায় ভরপুর মানুষটিকে, ভোলা যাবে না।

পরিশেষে বলা ভালো, এ বই লিখে আমি ধন্য হয়েছি, মনে হয়েছে আমার প্রিয়তম কবিকে হয়তো দিতে পেরেছি বনফুলের মালা আর শিশিরে ভেজা শিউলিফুলের অর্ঘ্য।

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫
আসানসোল

ভুল হ'য়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হ'য়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।

এই ভুলটুকু বেঁচে থাক,
বাঙ্গালী বলতে একজন আছে
দুর্গতি তার ঘুচে যাক।

—অন্নদাশঙ্কর রায়

যখন বাতাসে ঘূর্ণী
টান লাগে শিকড়ে শিকড়ে
তখন তোমাকে মনে পড়ে।

খুঁজি না রাস্তার নামে
জানি নেই মর্মর মূর্তিতে
তুমি থাকবে, তুমি আছো
আমাদের নিত্য দুঃখ জয়ের সংগ্রামে।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লেখকের অন্যান্য বই :—

বাউলের মন (কাব্যগ্রন্থ)

একাকী সংলাপ (,,)

স্বদেশ আমার মা (কাব্যগ্রন্থ—দ্বিতীয় সংস্করণ)

জলছবি (কাব্যগ্রন্থ—যন্ত্রস্থ)

শতকৌতুক

কৌতুক আরো আরো

সাহিত্য-কুইজ

বরণীয় মানুষের স্মরণীয় গল্প

শোনাই শোনো গল্প শোনো

এক

এখন কথা বোলো না। তোমার লালধূলো মাখানো পাদুকা খুলে রাখো বাইরে। এসো, নম্রচরণে এসো। এসো, ভালবাসায় এসো। আগুন হয়ে ওঠো, পুড়ে যাক যত অহংকার, এসো তোমার প্রণাম নিবেদন করো।

এই সেই পুণ্যভূমি। রৌদ্রদহনে জ্যৈষ্ঠের দাবদাহে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে চারিদিক। রাজা নরোত্তম দাসের গড় থেকে ভেসে আসছে উষ্ণ নিশ্বাস। পীর হাজী পালোয়ানের পীরপুকুরের শীতল ছায়ায় চলো অনিমেষ, একটু বসি আমরা। হারুত মারুত অশ্বত্থের ঝিকিমিকি আলোছায়ায় চলো চলে যাই সেই ফেলে আসা দিনগুলির কাছাকাছি ; চলো যাই অগ্নিবীণায় শুনে আসি বিদ্রোহের জয়গান।

কথা বোলো না অনিমেষ। তিনি ঘুমিয়ে আছেন, জেগে যাবেন। ঘুমিয়ে আছেন তাঁর অফুরাণ ভালবাসার প্রতিমা। বিঘ্নিত হবে শান্তি। ঐ ছাখো, মৌন মাটি তার গল্প শোনাতে চায়। ছাখো, তোমার তন্ময়তায় ভেসে উঠছে একের পর এক ছবি। তুমিও চলো অনিমেষ, ঐ যে আসছে মহামিছিল, চলো পায়ে পা মেলাই, হাতে হাত রাখি, চলো আমরাও বলি—

হিন্দু না ওরা মুসলিম—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী, বলো ডুবিছে মানুষ—সন্তান মোর মা'র।

এই তো তোমার দু'চোখে জ্বলেছে আগুনের লেলিহান শিখা, এই তো পুড়ে যাচ্ছে ব্যভিচার, অন্যায়ের যত জঞ্জাল, এই তো ফুলে উঠেছে তোমার বুক। জানি অনিমেষ, তুমি বুঝতে পেরেছ একথা কার, বুঝতে পেরেছ তুমি এসে পৌঁছেছ চুরুলিয়ায়—কবিতীর্থে, মানবতার মিলনক্ষেত্রে। ঠিক তাই অনিমেষ, তোমার সঙ্গে চলো আজ আমিও যাই।

ঐ শোনো বাজে যুদ্ধের দামামা। চার মহাসাধক আউলিয়ার গ্রাম চুরুলিয়ার আশেপাশে, জয়নগরে, রুণাকুড়ায়, অজয়নদের তীরে তীরে রাজা নরোত্তমের সঙ্গে ইছাই ঘোষের যুদ্ধ। হাওয়া এসে উল্টেপাল্টে দিয়েছে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা। এসেছে বর্গীর আক্রমণ। এসেছে বাদশাহী শাসন। তোমার বৃথা চেষ্টা অনিমেষ, গ্রামীণ মানুষ ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা গুছিয়ে রাখে নি, অঙ্ক মিলবে না, মিলতে পারে না। ঠিক যেখান থেকে অঙ্ক মিলবে, বরং চলো আমরা সেই দিনগুলোর স্মৃতি খুঁজে ফিরি।

সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী ১৮১০ সাল। চারিদিকে ধ্বংসাবশেষ। দুর্গের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিতে অনেক শোষকের নাম, অত্যাচারীর লোভলালসার ছবি। তারই মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে চার আউলিয়ার গ্রাম, চুরুলিয়া। আর বাদশাহী নির্দেশে তখন আরব থেকে ভারতের পাটনায় এসেছেন এক বিচারনিপুণ কাজীসাহেব। তুমি হয় তো ভাবছো অনিমেষ, আমি তোমাকে নম্র শান্ত থাকতে বলে নানান রঙীন গল্প শোনাবো। না, তোমাকে রূপকথা শোনাচ্ছি না আমি—শোনাতে চাই এই ঘুমিয়ে থাকা মানুষটির পূর্বপুরুষের ইতিহাস। আর তুমি তো জানো, হঠাৎ করে একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না, তার পেছনে থাকে দাদু-বাবা-মায়ের অলিখিত অবদান, সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা, থাকে ঘাত প্রতিঘাত—এর সঙ্গেই যুদ্ধ করে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক একটা ব্যক্তিত্ব, যাকে কেন্দ্র করে আশা নিরাশায় দুলতে থাকা লক্ষ কোটি জীবন সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখে, প্রতিবাদের ভাষা শেখে, প্রতিরোধের সাহসে সাহসী হয়ে ওঠে। অনিমেষ, আজ আমি তোমাকে এই লালধূলোমাখা, অজয়ের আদর ছোঁয়া, যন্ত্রণার কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত অথচ প্রভাতসূর্যের উজ্জ্বল হাসিতে ভরপুর, লক্ষ মানুষের কাণ্ডারী কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করাবো। জানো অনিমেষ, যে ফুল ফুটতে জানে সে বাধা বিপত্তি মানে না, যে গান গাইতে জানে, সে লোকলজ্জার ধার ধারে না, যে বিকশিত হয়ে উঠতে চায় খ্যাতির মধ্যগগনে, সে জানে দুঃখের ঝড়বৃষ্টি, মেঘবাদলকে

তুচ্ছ করতে—আর জ্যৈষ্ঠের ঝড়ো হাওয়ায় যার জন্ম, দুঃখের অতল শীতলতা তার কি করতে পারে ?

পাটনা থেকে কাজীসাহেবকে ডেকে পাঠালেন সম্রাট শাহ আলম। হজরত গোলাম নক্সবন্দ দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে আর নিষ্কর আয়মা সম্পত্তি পেয়ে চুরুলিয়ায় বসবাস সুরু করলেন। বাদশাহের নির্দেশে এক বিরাট এলাকায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে হোলো তাঁকে। সেই বংশধারারই সুসন্তান কাজী আমিনুল্লাহ, এক স্থিতধী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সাহিত্য অনুরাগী পুত্র কাজী ফকির আহমদের জনক। ফকির আহমদ জ্ঞানসঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলেই হয় তো অর্থসঞ্চয়ে মন দিতে পারেন নি, কাজেই চুপিচুপি দারিদ্র্য তাঁর খড়ের চালে, উঠোনে এবং হেঁসেল ঘরে কখন যে বাসা বেঁধেছিল, স্ত্রী জাহেদা খাতুন মরহুমা যে নীরবে নিঃশব্দে সব কিছু মেনে নিতেন—এটা যেদিন ফকির আহম্মদ জানতে পারলেন, তখন তাঁর ঘরে, ব্যথাবিধুর সংসারে হামাগুড়ি দিচ্ছে এক দুরন্ত বালক, কেউ ডাকে নুরু বলে, ফকির আহমদ আর জাহেদা খাতুম ডাকেন দুখু বলে।

অনিমেষ, তুমি বোধহয় ভাবছো ফকির যখন, তখন তার থাকতে পারে না কিছুই। আবারো ভুল ভেবেছ অনিমেষ। চল্লিশ বিঘা উর্বর জমির মালিক, কোরাণ পাঠ ও পঠনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ফকির আহমদকে তাহলে তুমি চিনতে পারো নি। বাংলা এবং উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত, আরবী, ফারসী আর সংস্কৃত ভাষার মুগ্ধ পাঠক, ছাপার অক্ষরের মত গোটা গোটা হাতের লেখা, মজলিস আর বৈঠকে ছোট বড় সকলের কাছের মানুষ, অথচ সংসার জীবনে বেপরোয়া উদাসীন, পাশাখেলার সর্বনাশা নেশার অনুগত ধর্মভীরু এই মানুষটি একদিকে যেমন একের পর এক সন্তান হারাচ্ছিলেন, তেমনই চরম উদাসীনতায় সংসারযুদ্ধে রসদ জোগাতে হারাচ্ছিলেন তাঁর যাবতীয় ভূসম্পত্তি। দীন দুনিয়ার মালিকের কাছে আত্মসমর্পিত ফকিরকে তাই তুচ্ছতার স্বল্প আলোকে যদি চিনতে না পারো, সে দোষ তোমার নয়, আমাদেরও।

ইংরাজী সন ১৮৯৯, তারিখ ২৪শে মে। বঙ্গাব্দ ১৩০৬, ১১ই

জ্যৈষ্ঠ। ভোলা যাবে না এই দিনটিকে, কেউ পারবে না। মেকী সভ্যতার আবরণে নির্লজ্জ ব্যস্ততায় তথাকথিত শিক্ষার মুখোসে আবৃত কেউ কেউ ভুলতে চায় কিন্তু পারে না। ঐতিহাসিক এই দিনটিতে সারা দেশ জুড়ে যে প্রাণময় প্রবাহ, তাতে এরা খড়কুটোর মত ভেসে যায়। অনিমেষ, মনে রেখো এই তারিখটি তোমার অহংকার, তোমার গর্ব, তোমার চেতনার সূর্য, এই দিনটিতেই জন্মেছেন কাজী নজরুল ইসলাম সেই প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে—যা বাসুকী নাগের ফণাকে ভয় করে না, স্রষ্টার বুকে ভৃগুর মতন পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে, এসেছেন দুর্বার, দুরন্ত অনির্বাণ অগ্নিশিখার মত, যা মুহূর্তেই পুড়িয়ে দিতে পারে অত্যাচারীর দম্ভ, ভেঙ্গে দিতে পারে উদ্যত খড়্গ-কৃপাণ। জন্মের মুহূর্তে কেউ কি ভাবতে পেরেছিল এই শিশু একদিন হবে উন্নতশির, উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল মুছে দিতে হবে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, ভারতবর্ষের মানুষ তার জন্যে গৌরবের অহংকারে মাথা উঁচু করে পার হবে 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার!' তবু কি অবাক দ্যাখো, আজও আমাদের চিন্তাভাবনায় তাঁর জন্যে খরচ করার মত সময় নেই, তাঁর লেখা কাব্য ও অন্যান্য বিষয়ে মন হারাবার সময় নেই, অথচ হাতে গোনা আমাদের বাদ দিলে পশ্চিমবাংলার একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে ঘুম ভাঙ্গছে চেতনার, নজরুল অনুসারী মানসিকতার মিছিলে নব যৌবনের মুখগুলি ক্রমশঃই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

এ সব কথা থাক অনিমেষ। এসো আমরা দামাল দুখুর সঙ্গে হেঁটে বেড়াই। দেখে আসি দুষ্টু দুরন্ত দুখু কার লাউলতা কেটে দিয়ে ধেই ধেই নাচ সুরু করেছে, কার বেগুন গাছের শেকড় ছিঁড়েছে দুখু, কোন্ বাড়ীর ফুল গাছের ফুল উধাও, কখন যে দুখু কি করবে এই ভাবনায় তটস্থ প্রতিবেশী আর সে চোখের আড়াল হলেই পাড়াশুদ্ধ উৎকণ্ঠা। সে সব দিন আর কখনোই ফিরে আসবে না, এখনকার দিনে এই রকম দুরন্ত ছেলের জন্যে প্রতিবেশীর ভালবাসা তুমি আশাও কোরো না।

এর আগে মারা গিয়েছে চার ছেলে। বড় ছেলে সাহেবজান আর

সবার ছোট দুখু মিঞা, মেয়ে উম্মেকুলসন, এদের নিয়ে কুঁড়েঘরে সংসার চালান ফকির আহমদ। মাজারে[১] খাদেমগিরি[২] করে, মসজিদে ইমামতী[৩] করে, দলিল পত্র লিখে যা পেতেন, তাতেই কোনরকম চলে যেত সংসার। আর দুখুর মা জাহেদা খাতুন মরহুমা সুযোগ পেলেই ছুটতেন কেউ অসুস্থ হয়েছে খবর পেলেই, কিম্বা নিজেরা না খেয়ে অক্লেশে দিয়ে আসতেন সব খাবার, যার খাবার জোটেনি তার ঘরে। এরই মধ্যে জন্ম নিয়েছে দুখুর আরেক ভাই, কাজী আলি হোসেন, আরেক দামাল শিশু। অভাব বেড়েছে, অনটন বেড়েছে তবুও এদের মুখের হাসি অটুট রাখতে বাবা-মায়ের অলিখিত সংগ্রাম অব্যাহত থেকেছে।

দুষ্টু দুখুর দুষ্টুমি আর লেখাপড়া দু'টোই কিন্তু চলছে পুরোদমে। সাহেবজান আর পড়ে না, বরং এদিক ওদিক চাকরী খোঁজে। সব্বাই চায় নজরুল বড়ো হয়ে উঠুক, দশের একজন হোক। এদিকে লেখাপড়া শিখতে শিখতে শব্দের জাদুও শিখে ফেললেন নজরুল। এ যেন এক নতুন খেলা, কথা দিয়ে কথা মেলানোর, মনের কথাকে ছন্দে রাঙানো, এ যেন সাপুড়িয়ার বাঁশী উঠে এলো নজরুলের হাতে। পীরপুকুরের ছলাৎ-ঢেউ জল, হারুত-মারুতের ছায়াঘন স্নিগ্ধতা, নরোত্তম দাসের স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন গড়, হাতীশাল, সব কিছুর মধ্যেই যেন ছন্দের আনা-গোনা, নাম জানা আর না-জানা গাছ গাছালি পাখ পাখালি ফুলফলের সঙ্গে যেন দীর্ঘদিনের সখ্যতা, নজরুল একটু একটু করে মন হারাতে লাগলেন সেই প্রকৃতি মাধুর্য্যে।

কি জানো অনিমেষ, হয় তো অলক্ষ্যে ভাগ্য মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এই প্রকৃতি-প্রেমিকের কাছ থেকে। সাময়িক আঘাতে মানুষের মন ভেঙ্গে যায়, স্বপ্নের ঘোড়ারা পালিয়ে যায় দূর অরণ্যে আর আমাদের পরিবেশ হাততালি দেয় এই অবস্থা দেখে। আর এর মধ্যে আমরা

---

১ মাজার=দৈবশক্তিতে বলীয়ান সিদ্ধপুরুষের কবর। ২ খাদেমগিরি বা সেবাইত ৩ ধর্মনেতৃত্ব দেওয়া, নামাজ গুরু।

যারা সাধারণ মানুষ তারা ভেঙ্গে পড়ি, চুরমার হয়ে যাই, অন্তরালে হারিয়ে যাই। কিন্তু অনিমেষ, তুমি তো জানো নজরুল হারিয়ে যান নি, দুর্ভাগ্যের টুঁটি টিপে ধরে উড়িয়েছিলেন বিজয় পতাকা। হারিয়ে যান নি সুকান্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের মত লড়াকু সাহিত্য-সৈনিকরা। সে যুদ্ধ আজও চলছে, গ্রামে গ্রামে, শহরের অলিতে গলিতে, সাধারণ্যে, সাহিত্য-সৈনিকরা আজও যুদ্ধ করছেন, করবেনও যুগ যুগ ধরে।

অভাব ধীরে ধীরে ফকির আহমদকে গ্রাস করে নিল। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র (ইংরাজী ১৯০৮) তাঁর এন্তেকাল হোল। সংসারের জন্যে রেখে গেলেন বুক ফাটা আর্তনাদ, অপরিসীম দারিদ্র্য আর আকাশজোড়া দীর্ঘশ্বাস। পাড়ার মক্তবের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, আট বছর এগারো মাস বয়সের নজরুল বুঝলেন তাঁর মাথা থেকে সরে গেল স্নেহময় শীতল ছায়া, বুঝলেন এখন থেকেই প্রখর সূর্যের খরদাহে তাঁকে জ্বলতে হবে, তাঁর দুষ্টুমিভরা ডাগর দু'টি চোখ জলে ভরে এলো, সর্বহারার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

এসো অনিমেষ, নজরুলকে কাঁদতে দাও—আমরা ততক্ষণ চুরুলিয়ার চারপাশের এলাকাকে চিনে আসি। পায়ে পায়ে চলো উত্তরের দিকে হাঁটি—সামনে অজয় নদ, কখনো নটরাজ, কখনো উদাসী, কখনো ভাঙ্গার হিংস্রতায় মগ্ন, কখনো বা কুলুকুলু নিরিবিলি বয়ে চলাতেই তার আনন্দ। ওপারে সাঁওতাল পরগণা, বিহার আর তারই পাশাপাশি বীরভূম জেলার এক বৃহৎ অংশ। ওপারেই কবি জয়দেব আর পদ্মাবতীর মধুর প্রেমের শাশ্বতক্ষেত্র। পূর্বে জামুরিয়া, হরিপুর, উখরা, পূর্ব-দক্ষিণাংশে কয়লাখনির আদিক্ষেত্র রাণীগঞ্জ। চলো যাই দক্ষিণে, শিল্পসমৃদ্ধ মিনি ভারতবর্ষ আসানসোল, পাশাপাশি দক্ষিণ পশ্চিম থেকে পশ্চিমে বার্ণপুর, কুলটি, বরাকর। বর্ধমান জেলার একপ্রান্তে এরকম এক গ্রামে যে এমন এক অগ্নিপুরুষ জন্ম নেবেন, এমন কথা কেই বা জানতো। বর্ধমান জেলা সাহিত্যে, শিল্পে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, সমাজকল্যাণে অনেক অনেক কৃতী সন্তানের জন্ম দিয়েছে—এসব কথা আরেক সময় শোনাবো তোমাকে। শুধু

একটা কথা মনে রেখো রাঢ়ভূমির রুক্ষতা, আসানসোল-রাণীগঞ্জের মিশ্রিত সংস্কৃতি ও সভ্যতা, সাংসারিক তীব্র দারিদ্র্য ও ঘটনাবহুল জীবন কবি নজরুলকে মোহমুক্ত বাঁধনহারা প্রাণময় পুরুষ করে তুলেছে আর অবহেলিত, শোষিত, উৎপীড়িত মানুষের জন্য বারবার কেঁদেছেন, রুদ্ররোষে গর্জন করেছেন। তাই নজরুল আসানসোল শিল্পাঞ্চলে পরম আত্মীয় কবি, প্রতি ঘরে ঘরে তিনি প্রিয় সহোদর-প্রতিম ঘরোয়া মানুষ, তাই তাঁকে ঘিরে আসানসোলের এত গর্ব। বিশ্বের অন্যতম প্রিয় কবি হিসেবে যখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আর বিদ্রোহী কবি নজরুলের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তখন গর্বে বুক ভরে ওঠে, আমি জানি অনিমেষ, তোমারও হাতের মুঠোয় তখন তুমি বজ্র ধরতে পারো, অবহেলায় সংগ্রাম করতে পারো বঞ্চনার বিরুদ্ধে।

নজরুলের চোখের জল এতক্ষণে বাষ্প হয়ে গিয়েছে। কয়লাখনিতে কাজ নিতে যাচ্ছে দাদা সাহেবজান। হেঁটে হেঁটে অনেকদূর··· অনেকদূর রাণীগঞ্জ। কোলের কাছে টেনে নিয়ে মা বলেছেন, দুখু তুই অনেক বড়ো হবি···সাহেবজান মাথায় হাত রেখেছে, তোকে লেখাপড়া শিখতে হবে···আর ভাই আলি বলেছে, কি মজা, তুইও পড়বি, আম্মুও পড়বো।

আপাততঃ তাই হোলো। অভাবকে যথাসাধ্য আড়ালে রেখে মাঝে মাঝে প্রতিবেশীদের সাহায্যে শুভেচ্ছায় এমনি করেই দু'টি বছর গড়িয়ে গেল, নজরুল ১৩১৬ সালে (ইংরাজী ১৯১০) পাড়ার মক্তব থেকে প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করলেন। ইতিমধ্যে আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠে তাঁর দখল এসেছে, অকৃতদার দিলখোলা চাচা কাজী বজলে করিম তাঁকে তখন শেখাচ্ছেন আরবী, ফারসী আর বাংলার শব্দ কারুকার্য্য। তামিল নিতে গিয়ে নজরুল দেখলেন চাচা অবসর সময়ে গুনগুন করেন, আরবী, ফারসী আর বাংলা মিশিয়ে গজল লেখেন। অনুরাগী নজরুল ছায়ানুসারী হোলেন চাচার, আর তখনই তাঁর মনের নিভৃত কোণে জন্ম নিল এক অমৃত-বাসনা, আমিও লিখবো গল্প, লিখবো গান, কবিতা, আরো কত কি। তুমি শুনে

আনন্দ পাবে অনিমেষ, উত্তর জীবনে নজরুল তাঁর বিভিন্ন আড্ডায় এই বরেণ্য চাচার কথা বলতেন আর ছোট্ট বয়সেই লিখেছিলেন এক দীর্ঘ কবিতা, যার ছত্রে ছত্রে ছিল চাচার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর মুগ্ধ বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে প্রবহমান যন্ত্রণার বিরুদ্ধে কি করা যায় ভাবতে বসেছেন মুরুব্বীর দল। সকলে এলেন মা জাহেদা বিবির কাছে এক প্রস্তাব নিয়ে : দ্যাখো দুখুর মা, ছেলে তোমার খুব ভালো হয়ে উঠেছে এখন। কি চমৎকার তার আচরণ, কি দারুণ তার বুদ্ধি। আমরা চাই ও এই মক্তবেই শিক্ষকতা করুক, তুমি যেন আপত্তি কোরো না।

আপত্তি! তা কি করা যায়। অপার করুণাময় আল্লাহতালার দোয়ায় দুখু আজ মক্তবের দায়িত্ব পাবে, যত সামান্যই হোক তবুও তো কিছু রোজগার করতে পারবে, এসেছেন পাড়ার মুরুব্বীরা, মা মত দিলেন। আর মুরুব্বীরা দেখলেন ধর্মীয় চেতনা তো নজরুলের প্রগাঢ় হয়েছে, আছে দায়িত্ববোধ, শিখেছে খুদ্‌বা-পাঠ করতে, রোজা রাখতে—একেই যদি ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্ষতি কি। তাই হোলো। তুমি এমনটি আর কোথাও খুঁজে পাবে না অনিমেষ, এত অল্প বয়সে মসজিদের ইমামতী আর মক্তবের মাষ্টারী আর কেউ কোথাও কখনো করেছেন কি না আমার তো জানা নেই।

আসমুদ্র হিমাচল যাঁর ঠিকানা, দূর যাকে ডাকে হাতছানি দিয়ে সে কি করে বাঁধা ধরা কঠিন নিয়মের শেকলে বাঁধবে তার উদ্দাম গতিকে—শেকলভাঙ্গার গান একদিন যার কণ্ঠে উচ্চারিত হবে, জেগে উঠবে ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত জনতা, তাকে কি বেঁধে রাখা যায়? ক্রমশঃ উন্মনা হোলেন নজরুল আর একদিন সোজাসুজি চাচার কাছে আর্জি পেশ করলেন—ভাল্লাগে না এত নিয়মকানুন, এত বন্ধন, আমি নীল আকাশের মত, পাখীর মত হতে চাই।

চাচার ব্যাকুল প্রশ্ন : তুই কি করতে চাস্ নুরু?

নজরুল বললেন : আমি লেটোগান গাইবো, আমাকে আপনার

দলে নিয়ে নিন চাচা। নমুনা হিসেবে নিজের লেখা মজাদার দু'একটা গান গেয়ে শোনালেন চাচাকে। দিলখুস হয়ে গেল বজলে করিমের : বাঃ ঠিক আছে, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

কি অনিমেষ, ভাবছো হয়তো এ আবার কি? লেটোগান কি জিনিষ, কেমনতরো তার ভাষা এসব তো তুমি কিছুই জানো না। আমরা ক্রমশঃই দেউলিয়া হয়ে পড়ছি অনিমেষ। একে একে হারিয়ে যাচ্ছে লেটো, কবিগান, তরজা, ঝুমুর, ভাদু, টুসু, বাউল, কীর্তন, লোকগীতি; হারিয়ে যাচ্ছে পুরোনো পৃথিবী। চটুল গানের আসরে তাল ঠুকে ঠুকে 'কেয়া বাৎ' করে দিন পার করছি আমরা। অথচ সেই আমলে, আজ থেকে আশী পঁচাশি বছর আগে এই সবই ছিল আমাদের সংস্কৃতির একমাত্র অভীমন্ত্র, জাত নয়, পাত নয়, সবার উপরে মানুষ সত্য—একথা সমাজের কোণে কোণে ছড়িয়ে দেওয়ার একতারা। এই লেটোগানের মাধ্যমে অশিক্ষিত কৃষিজীবি মানুষদের কাছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পবিত্র বাণী ও নানান অলৌকিক কাহিনীকে তুলে ধরা হোত। ছড়া, গান, ধাঁধা, কথার লড়াই এই নিয়ে গানের আসরে দুই পক্ষের কাব্য লড়াই বেশ জমে উঠতো, আর একদিন নয়, দু'দিন নয়, প্রয়োজনে দিনের পর দিন চলতো এই সরস লেটোগানের আসর।

নজরুল যখন চাচা বজলে করিমের দলে পা রাখলেন তখন মোটাদাগের অন্ত্যমিল দিয়ে গানের আসর ভরানো হোত। নজরুল এর বিরোধিতা করলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন চাচাকে, বললেন, মানুষ যাতে কুপথে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। কাজেই ভাষা আগে ঠিক করতে হবে। রাগ করা দূরে থাক, চাচা পরম স্নেহে নজরুলকে বললেন, কোন্ গান গাওয়া হবে তুই ঠিক করবি, দরকার হলে নিজে লিখবি।

নজরুল খুসী হয়ে বললেন, শুনবেন, একটা গান বেঁধেছি আমি।

চাচা বললেন, বাঃ বাঃ, কৈ শোনা তো দেখি!

নজরুল নেচে নেচে গান সুরু করলেন। নিজের লেখা গান,

ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় দুলিয়ে দুলিয়ে, কোমরে হাত রেখে ভরপুর গলায় সুরু করলেন তিনি—

সে নমাজ আর বন্দেগীতে[৪] নাহি ফল ভাই রে
যাতে দেহের সাথে দেলের[৫] যোগ নাই রে।
মন আছে ক্ষেতে ভুঁইয়ে
তন[৬] আছে মজিদ[৭] ছুঁইয়ে
দেহ আর দেল—দূরে দুই ঠাঁই রে
তার চেয়ে গান গাওয়া ভালো—তারে নারে নাই রে······

চাচা তাঁর শ্বেতশুভ্র দাড়ি নেড়ে উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন আদরের নজরুলকে। কল্পনা করতে পারো অনিমেষ, এই দশ বছর বয়সে তুমি আমি ডাংগুলি কিম্বা চু-কিৎ-কিৎ খেলেছি, বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট, দুষ্টুমি করেছি কিন্তু এইভাবে গান গাওয়া, মুখে মুখে গান বা পদ্য রচনা করা—কল্পনাও করতে পারিনি। মনে রাখতে হবে অখ্যাত একটি গ্রামের সাধারণ এক পরিবারে দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে কাটাতে যে ছেলেটি এই রকমের গান লিখতে পারে, নেচে নেচে সেই গান গাইতে পারে, সে যে এত বড়ো, বিরাট বড়ো আকাশের মত বড়ো হয়ে যাবে—এটা আপনজনেরা কেউই বুঝতে পারেন নি সেদিন। বুঝতে আমরা কেউই পারি না। তারাশংকরকে লাভপুর বুঝেছে অনেক দেরীতে, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে চিনেছি আমরা, নজরুলকে তাড়াতাড়ি চিনবো এমন মনুষ্যত্ব আমাদের নেই অনিমেষ—অবহেলায় তাঁকে হারিয়েছি। আমাদের অকৃতজ্ঞতায় তাঁর মরদেহ বাংলাদেশে রেখে এসেছি আর এখন চারিদিকে যখন নবযৌবনের গান শুনছি তখন লজ্জা পাচ্ছি কিম্বা লজ্জিত হবার ভান করছি। এই আমাদের দেশ, হয়তো এমনি করেই আমরা বেঁচে থাকবো।

চলো অনিমেষ, চাচা বজলে করিমের লেটোর আসরে যাই। সেখানে এই বাংলার অগ্নিশিশু, দুখুমিঞা গান ধরেছে, ঝাঁকড়া চুল

---

৪ বন্দনাগান ৫ হৃদয় ৬ শরীর ৭ মসজিদ

উড়িয়ে নাচ জুড়েছে। কানে কানে তার সঙ্গে এইমাত্র যে কথা বলে গেল, সে লোকটি মোটেই হেলাফেলার নয়। চাচার বিপক্ষদলের নেতা শেখ চাকর গোদা তাঁর লেটোদলে নজরুলকে ঢুকে পড়তে শলাপরামর্শ দিয়ে বসে পড়লো নিজের সঙ্গীদের কাছে। আর 'ময়না, বন্দী কোথাও রয় না' ভেবেই টুক করে নজরুল দল পাল্টালেন, যোগ দিলেন চাকর গোদার দলে। পরবর্তীকালে এই অস্থির নজরুলকে আমরা দেখেছি বার বার স্থান পরিবর্তন করতে, এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে, এক হাট থেকে আরেক হাটে ভেসে বেড়িয়েছেন, পেছন ফিরে তাকান নি কোনদিনই, চুরুলিয়া থেকে দোমোহানী, কেলেজোড়া থেকে বিশ্বজোড়া ঘরে ঘরে পেতে নিয়েছেন তাঁর আসন নিজস্ব গুণে, আপন মনন-ঐশ্বর্যে কখনো হয়েছেন খরদাহ প্রবল সূর্য, আবার কখনো হয়েছেন স্নিগ্ধ প্রেমের পূর্ণিমা, কখনো হয়েছেন উদাসী আউল বাউল, কখনো সংগীতের বিচিত্র ধারায় সবাইকে দিয়েছেন ভাসিয়ে।

চাকর গোদার দলে এসেই নজরুল যেন বিশ্বজয় করলেন। তাঁর গানের দাপটে, প্রকাশভঙ্গীতে বিপক্ষদল হিমসিম খেতে লাগলো। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর—সর্বত্র জয়ের মালা ছিনিয়ে আনলেন নজরুল। এগারো বছর বয়সের এই টগবগে কবিকে দেখতে আর তার ছড়াগান শুনতে ভীড় করে আসতে লাগলো গাঁয়ে গঞ্জের মানুষ। চাকর গোদা বললেন—এ আমার ব্যাঙাচি কবি—একদিন বড় হয়ে খরিশ সাপ হবে। হয়েছিলও তাই, নজরুলের বিষের মতন তীব্র লেখার জ্বালায় টলে উঠেছিল সাম্রাজ্য-বাদের আসন। বড়ো হয়ে নজরুল বলেও ছিলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতায়—

আমি নাগশিশু, আমি চঞ্চল
আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল।

লেটোর দলে নজরুল একের পর এক তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। কত যে মজাদার বাংলা গান, ইসলামী গান, ব্যঙ্গ ছড়া ঐ অল্প বয়সে তিনি লিখেছেন তার হিসেব আজ আর মেলে না।

লেটোগান ছাড়াও ঐ সময়ে চাষার সঙ, শকুনি বধ, রাজপুত্র, দাতাকর্ণ, আকবর বাদশা, কবি কালিদাস, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি নাটিকাও লিখেছিলেন তিনি। দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য, সেই মূল্যবান রচনাগুলি আজ খুঁজে পাওয়া যায় না, নয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর না হয় এমন কোথাও আছে যার হদিশ কখনোই মিলবে না। দীর্ঘশ্বাসে, দুঃখে তোমার বুক ভরে উঠছে অনিমেষ, আমি জানি—কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশ আমাদের দাঁতের মর্য্যাদা শেখায় নি, ইতিহাসকে লালন করতেও শেখায় নি। তোমাকে শোনাই শোনো নজরুলের সেই বয়সের এক বিচিত্র স্বাদের ইংরেজবিরোধী লেটোগানের এক অংশ—

রব না কৈলাসপুরে, আই এ্যাম ক্যালকাটা গোয়িং
যত সব ইংলিশ ফ্যাসান—আহা মরি কি লাইট্‌নিং
ইংলিশ ফ্যাসান সবই তার
মরি কি সুন্দর বাহার, আর
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার
কাম অন ডিয়ার গুডমর্ণিং।

অথবা বিপক্ষদলকে ব্যঙ্গ করে যেখানে নজরুল নিজেকে বলেছেন সিংহশিশু আর বিপক্ষদলকে নামিয়ে এনেছেন বাঁদরের ভূমিকায়, সেই জায়গাটা একটু শোনাই তোমাকে—

ওহে ও ছড়াদার……
ওহে ছড়াদার ওহে হ্যাট পাল্লাদার
মস্ত বড় ম্যাড—
চেহারাটাও মান্‌কি লাইক
দেখতে ভেরী ক্যাড।
মান্‌কি লড়বে বাবরকা সাথ
ইয়ে বড়া তাজ্জব কি বাত
জানে না ও……
জানে না ও ছোট হলেও
হম্‌ ভি লায়ন-ল্যাড।

মনে পড়ছে অনিমেষ, একটু আগে তোমাকে বলেছি 'ময়না—বন্দী কোথাও রয় না'—অতএব একদা প্রভাতকালে পলাতক নজরুল। পেছনে পড়ে থাকলো পাণ্ডুলিপি, প্রিয় সঙ্গীসাথী, চাকর গোদা, যশ খ্যাতি সব কিছু। ইতিমধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা এলাকার আশে পাশে স্থায়ী আসন পেতেছে। খোসনগর, মদনপুর, মৌহজুড়ি, হিজলগড়া, বক্তারনগর, অণ্ডাল—এই সব এলাকায় সুদর্শন পালাকার, নট ও পরিচালক কাজী নজরুল ইসলামকে লোকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে। আর হিজলগড়া তো কোনদিনই নজরুলকে ভুলতে পারবে না। এই তো সেদিনই প্রবল প্রতিপক্ষ ইসহাক মিঞার গলায় পুঁটিমাছের মালা পরিয়ে দিয়ে ছিনিয়ে এনেছেন দলের জন্যে জিলাপীর রসালো মালা। গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে ঘুরছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নজরুলের ভরাট গলার সেই গান—

পাল্লা সাথে লেটোর ল্যাঠা লাগলো
ছড়াদার ও দোঁহাররা সব ভাগলো।
ওদের ছন্দ সুরের মিল নাইকো গানেতে
ও' মিঞার জ্ঞান নাইকো তালেতে
ওদের মাটির সাথে আক্‌ড়া মিশাল্ ধানেতে
ষাঁড়ের সাথে গাধা বাঁধা থামেতে
দেখে ইহা ভদ্রলোকে রাগলো।

তা, এই জনপ্রিয়তার মালাকে অবহেলায় সরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন নজরুল। চাকরী চাই, সুস্থ জীবন চাই—এমন একটা ভাবনা তাঁর মাথায় ভর করলো। তাই লেটোর দল থেকে নিঃশব্দ নীরবে বিদায় নিলেন নজরুল আর কাছাকাছি শহর আসানসোলে এলেন চাকরীর খোঁজে। মুহম্মদ আহাদ বক্সের পাঁউরুটি কারখানায় চাকরী জুটেও গেল। বেকারী-বয়ের চাকরী, থাকা খাওয়া আর পাঁচটাকা বেতন (প্রখ্যাত নজরুল-গবেষক আবদুল আজীজ আল আমানের মতে বেতন ছিল একটাকা)—এতেই নজরুল খুসী। আসলে নৌকো তো পাল্টানো হোল, হোক না তা পালছেঁড়া। অনিমেষ, তুমি তো

অনেকবার নৌকোয় চেপেছ, দেখেছ দক্ষ মাঝি তার পালছেঁড়া নৌকোতেই মনের আনন্দে যাত্রী পারাপার করে থাকে, গান ধরে গভীর প্রশান্তিতে। নজরুল চাকরী করতে এলেন ঠিকই কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের ভেতর থেকেই খুঁজে নিতে লাগলেন বেঁচে থাকার মূল সুর, আগামীদিনের মণি মুক্তো। এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটা কথা বলবো অনিমেষ। আমরা এক একজন বরেণ্য পুরুষকে নিয়ে গালগল্প তৈরী করে বেশ আনন্দ পাই আর সমাজে সবজান্তা কেষ্ট বিষ্টু সাজতেও চাই। এটা আমাদের স্বভাব। নজরুল প্রসঙ্গে যে যাঁর যেমন খুসী লিখেছেন, কত গবেষক যে কত সত্যমিথ্যা বলেছেন, কত অকারণ গল্প শুনিয়েছেন তার আর হিসেব নেই। তুমি তো জানো অনিমেষ, সেই ছেলেবেলা থেকেই নজরুল-পরিবারের সঙ্গে মিশেছি, কাছের থেকে জানবার চেষ্টা করেছি আর তাতে আমার মনে হয়েছে এবার এসব বানানো গল্পের শেষ হওয়া দরকার, গণজাগরণের সূর্যালোকে জ্যোতির্ময় অগ্নিতাপস নজরুল সম্পর্কে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করা দরকার। এই রুটির দোকানে চাকরী করার ব্যাপারে যার যা মাথায় এসেছে তাই লিখেছেন, নজরুলের পরবর্তী জীবন নিয়েও লেখার স্বেচ্ছাচার চলেছে।

অনিমেষ, এক একজন সত্যদ্রষ্টা যুগপুরুষ আসেন, যাঁকে সব কিছু সহ্য করতে হয়, বহু ত্যাগের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে হয়। ধর্মীয় নেতা শ্রীকৃষ্ণ, হজরত মহম্মদ, যীশু খ্রীষ্ট থেকে সুরু করে সবক্ষেত্রেই তুমি ভ্যাখো, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে, নজরুলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আমি বাকরুদ্ধ নজরুলকে দেখেছি, প্রণাম করেছি, তাঁর আগুনের গোলার মত জ্বলন্ত দু'টি চোখ দেখেছি। সেই ছেলেবেলায় যা মনে হয়েছিল আজও আমার সেই ধারণা থেকে আমি সরে যেতে পারি নি। কেমন যেন মনে হয়েছে আমার, এই মহান পুরুষের জন্য যা করা উচিত ছিল তা করা হয় নি, যা মূল্যায়ণ করা কর্তব্য ছিল তা করা হয় নি, সে মর্য্যাদা দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয় নি। আমাদের এখনও অনেক কাজ করা বাকী আছে অনিমেষ,

দেরীতে হলেও সুরু হয়েছে সেই কাজ, আমি জানি আগামী দিন সেই নব জাগরণের, নজরুল মূল্যায়নের ইতিহাসকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবে।

চলো. ফিরে যাই রুটির কারখানায়, হুগলীর বিখ্যাত পরিবারের আসানসোলের যে রুটি কারখানায় কবি এখন চাকরী করছেন, সেখানে ত্মাখো এক মৌনী ফকির এসে দাঁড়িয়েছেন নজরুলের কাছে। মৌনী ফকির আর সরব নজরুল কখন যেন একে অপরকে ভালবেসে ফেলেছেন। আর এরই মধ্যে একদিন নজরুল খবর পেলেন সেই মৌনী ফকিরের এন্তেকাল ঘটেছে। ছুটে দেখে এলেন, পথের ধারে পরমনিদ্রায় শায়িত তাঁর নীরব বন্ধুর চিরনীরবতায় দুঃখে ফিরে এসে অশ্রুসজল কবিতা লিখলেন, যার কিছু অংশ শোনাই তোমাকে—

বুকের বেদনা বুকেতে রাখিলে ঢাকি
মরণের দিনে সেই বুকে হাত রাখি
দেখাইয়া গেলে ঐ স্থানে আছে লেখা
ব্যথার কাহিনী যাহা যায় নাক' দেখা।

আরো বললেন চোখের জলে ভিজে—

তুমি জেনেছিলে মোরে আপনার জন
তাই তব লাগি কাঁদিতেছে মোর মন।

আগুন কখনোই ছাইচাপা থাকে না, ফুল পারে না তার সৌগন্ধ লুকোতে। রুটির দোকানে কাজ করতে করতেই নজরুল একদিন এক পুলিস অফিসারের চোখে পড়লেন। সংগীতরসিক এই পুলিস অফিসারটির নাম রফিজউদ্দীন, আসানসোলে চাকরী করছেন কিন্তু বাড়ী অনেকদূর, ময়মনসিংহ জেলার সিমলা গ্রামে। নজরুলের বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ, সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা দেখে মুগ্ধ হোলেন আর একদিন রুটির দোকানের মালিককে বলে কয়ে নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন সিমলা গ্রামে।

নজরুল মনের আনন্দে পা বাড়ালেন। আবার লেখাপড়ার সুযোগ এসেছে সামনে, অনেক নতুন জায়গা দেখা হবে, চেনা হবে কত নতুন মুখের সঙ্গে, প্রকৃতির রূপরসগন্ধকে পাওয়া যাবে আপন

করে, নজরুল রফিজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পৌঁছে গেলেন সিমলায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে দারোগা সাহেব তাঁকে ভর্তি করে দিলেন গ্রাম থেকে পাঁচমাইল দূরে দরিরামপুর হাই স্কুলে।

পুরোনো দুষ্টুমিতে পেয়ে বসলো নজরুলকে। প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াতের পথে তাঁর নানান দুষ্টুমিতে তখন অস্থির ঐ এলাকার মানুষ। তারই মধ্যে নজরুল সবাইকে গান শোনান আবার ক্লাসের পড়াও ঠিকমত করে যান। বাইরে থেকে এসে একটি ছেলে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, শিক্ষকমশাইদের ভালবাসা অর্জন করবে—এটা অনেক ডানপিটে ছাত্রেরই চক্ষুশূল হয়েছিল তাই এদের হিংসায় ভালভাবে পরীক্ষা দিয়েও ফলাফল দেখার মত ধৈর্য্যে কুলোয় নি নজরুলের। একদিন সবার অজান্তে, কাউকে কিছু না বলে আবার পালালেন আর ভাসতে ভাসতে এসে উঠলেন এক রেলওয়ে গার্ডের আশ্রয়ে, প্রসাদপুরে। মাত্র মাস তিনেক সেখানে কাটিয়ে, মাতাল গার্ডের বেয়াদপিতে বিরক্ত হয়ে নজরুল আবার পলাতক—আর এবার সোজা চুরুলিয়ায়।

নজরুলের এই পলায়নবাদী মনোভাব আর বার বার স্থান পরিবর্তন, শিক্ষাজীবনে বার বার আঘাত—একে কেন্দ্র করে অনেক জীবনীকার অনেকরকম কথা লিখেছেন। কেউ গল্প লিখেছেন, কেউ মনগড়া কথার জাল বুনেছেন, আবার অনেকে আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে লিখে বাহাদুরী দেখিয়েছেন। কিন্তু অনিমেষ, সময় আর বয়স কারো জন্যে বসে থাকে না, ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করলেও কালের কষ্টিপাথরে তার মূল্য থাকে না। নজরুলকে কেউ কেউ পলায়নবাদী কবি বলে আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন, কিন্তু নজরুল-মানসিকতার ধারে কাছেও তাঁরা ঘেঁষতে পারেন নি, দূর থেকে যা হোক একটা কিছু লিখে নজরুল প্রেমিক সাজতে চেয়েছেন। এদের জন্যে দুঃখ হয় অনিমেষ, আমার মনে হয় এঁরা নজরুলের বাকরুদ্ধ পরিস্থিতির আর পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের সুযোগ নিয়ে এবং প্রতিবাদের সম্ভাবনা নেই জেনেই একটা কিছু করার বাসনায় লালা ঝরিয়েছেন। এদের ক্ষমা করো অনিমেষ, বরং আমরা নজরুলের

পরবর্তী দিনগুলির অনুসন্ধান করি, এসো যথার্থ স্মৃতিতর্পণ করি।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন, 'নজরুল ইসলাম নিজে আমাদের নিকটে তিনটে হাইস্কুলে পড়ার কথা বলেছে। ময়মনসিংহ জিলার দরিরামপুর হাইস্কুল, বর্ধমান জিলার মাথরুন হাইস্কুল এবং রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুল।' আমরাও এই কথার সমর্থনযোগ্য ইতিহাসকে পাচ্ছি চোখের সামনে। তবে জানা গিয়েছে নজরুল একবার নয় দু'বার শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, প্রথমবারে কিছুকাল পরেই স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মাথরুন হাইস্কুলে, আর তার বেশ কিছুকাল পরে আবার ফিরে এসেছিলেন শিয়ারশোলে আর এই ফিরে এসে পড়াশুনা করতে করতেই চলে গিয়েছিলেন সৈন্যদলে।

চুরুলিয়ায় ফিরে আসার পরে পরেই তাঁকে আত্মীয়স্বজনের চাপে ভর্তি হতে হোলো শিয়ারশোলে। কিন্তু মুসলিম হোষ্টেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ও ফারসী শিক্ষক মৌলভী আব্দুল গফুর সাহেবের সঙ্গে তাঁর মানসিক সংঘাত বাধলো তীব্রভাবে, ফলে বেশীদিন পড়া হোলো না ঐ স্কুলে। শেষ পর্য্যন্ত পালিয়ে গেলেন নজরুল, এক পরিচিত বন্ধুর সূত্র ধরে মঙ্গলকোট থানার মাথরুনে। সহায় সম্বলহীন একাকী নজরুল রাণীগঞ্জ থেকে বর্ধমান, বর্ধমান থেকে ছোট লাইনের ট্রেন ধরে কৈচর স্টেশনে নেমে পায়ে পায়ে এসে হাজির হলেন মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পিতৃভূমি মাথরুনে, তখনকার দিনে বিখ্যাত নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউসনের দোর গোড়ায়—প্রধান শিক্ষক ও প্রখ্যাত পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাছে। বিনম্র প্রণাম জানাতেই কুমুদরঞ্জন জানতে চাইলেন তার পরিচয়। এক প্রবীণ কবির কাছে আগামী দিনের এক জ্বলন্ত সূর্য, ভারতের অন্যতম বরেণ্য কবি তার মনোবাসনা খুলে বললেন। দরদী কুমুদরঞ্জন নজরুলকে ভর্তি করে নিলেন তাঁর স্কুলে, বিনা বেতনে বিনা খরচে নজরুল সেখানে পড়ার সুযোগ পেলেন নতুন করে। চঞ্চলতা কিন্তু কমলো না, পড়াশুনার ফাঁকে সুযোগ পেলেই মাঠের সবুজ গালিচায় গা গড়ানো কিম্বা গাছে চেপে দোল

খাওয়া, গলা ছেড়ে গান গাওয়া, হেঁটে হেঁটে কুলসুনা, মাজিগ্রাম, কুমুদরঞ্জনের গ্রাম কোগ্রাম, ঐতিহ্যমণ্ডিত কাটোয়া এবং তার আশে পাশে গ্রাম দেখে দেখে বেড়ানো এসব চলতে লাগলো পুরোদমে। আর নজরুল হাঁটবেন কিন্তু গান গাইবেন না—এমন হতে পারে না, গান গাইবেন আর ভক্তদল জুটবে না, এমনও হতে পারে না—ফলে গ্রামে গ্রামে সব ঘরে ঘরে জেনে গেল সবাই মাথরুন স্কুলে এক ডানপিটে ছেলে এসেছে, সে পড়াশুনায় ভালো, গান গায় ভালো আবার কবিতাও লেখে দারুণ। ফলে এখানেও নজরুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। পঞ্চম আর ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত মন দিয়ে পড়লেন, পেলেন সকলের আশীর্বাদ, ভালবাসা, শুভেচ্ছা।

কবি-শিক্ষক কুমুদরঞ্জনকে নজরুল ভক্তি করতেন দেবতার মত। গুরুভক্তি তাঁর অপরিসীম, অবিচল শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় হৃদয় ভরপুর কানায় কানায়। পরবর্তীকালে নানা প্রসঙ্গে এই সম্পর্কের কথা কুমুদরঞ্জন সভায় সমিতিতে আলোচনা করেছেন, স্মৃতিকথায় লিখেছেন, নজরুলকে নিয়ে কবিতাও লিখেছেন। আমার বাড়ী চুরুলিয়ায় শুনে কুমুদ-কবি আলাদা স্নেহের চোখে দেখতেন আমাকে, বলতেন, তুমি ধন্য, যে ঐ গ্রামের মাটি তোমার সর্বাঙ্গে লেগে আছে। এ সব শুনে সেই তরুণ বয়সে মন ভরে যেত অনিমেষ। জন্মেছি মহাভারতের কবি কাশীরামের গ্রাম সিঙ্গিতে আর লালিত পালিত হয়েছি নবভারতের কবি নজরুলের গ্রামে, এ আমার অসীম পূণ্যফল, সত্যিই আমি ধন্য।

সপ্তম শ্রেণীতে প্রমোশন পাবার পরেই আবার সেই পালিয়ে যাবার ইচ্ছে নজরুলকে বিব্রত করে তুললো। এক জায়গায় বন্দী হয়ে থাকার ছেলে নজরুল নন, কাজেই আবার বিদায় নেবার পালা। কিন্তু কেমন যেন মনের মধ্যে গৃহমুখী চিন্তাভাবনা, তাই কোথাও না গিয়ে নজরুল ফিরে এলেন চুরুলিয়ায়।

ইতিমধ্যে চাচা কাজী বজলে করিমের অকালপ্রয়াণ ঘটেছে। মানুষ শোকাচ্ছন্ন। কবি অন্তরে পিতৃবিয়োগের ব্যথা অনুভব করলেন, বেদনাভরা এক দীর্ঘ মুর্শিয়াগীতি রচনা করলেন গুরুর উদ্দেশ্যে—

হায় আমরা কি ভাগ্যহীন হেন ওস্তাদ প্রতিম
কাজী বজলে করিম হারিয়েছি।
ঠিক এ পোড়া কপালে হারায়ে রত্ন অকালে
শোকে বুক নয়ন জলে ভাসায়েছি।

গভীর বোধ ও চেতনায় তিনি বললেন—

অনিত্য এ সংসারে যদি তিনি গেছেন চলে
তাঁহার অক্ষয় কীর্তি অমর সর্বকালে
তিনি হন জিন্নতবাসী এই দোয়া দিবানিশি
রহিম রহমানের কাছে করিতেছি।

তখন লেটোদলে ভাঙ্গন ধরেছে। ওস্তাদহীন এই দল নজরুলকে ধরেছে, ভাঙ্গনের গতিরোধ করে দলের দায়িত্ব নিতে। কিন্তু আর তা সম্ভব নয়, পড়াশুনা করতে হবে, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া এই সংসারকে বাঁচাতে হবে এমন ভাবনায় ব্যস্ত নজরুল। তবু লেটোর সঙ্গীসাথীরা আশা ছাড়েনি, কিন্তু অনেক পরে যখন নজরুল যুদ্ধে চলে গেলেন, তখনি এরা শোকার্ত হয়ে গেয়ে উঠল—

আমরা এই অধীন
হয়েছি ওস্তাদহীন
তাই ভাবি নিশিদিন
বিষাদ মনে।
... ...
নামেতে নজরুল ইসলাম
কে দেবে তার গুণের প্রমাণ
না পাই তার কোন সন্ধান
কোনও খানে।

লেটোদলের গায়কেরা আর ফিরে পেল না নজরুলকে তাদের মধ্যে কিন্তু শিয়ারশোল স্কুল তাঁকে আবার ছাত্র হিসাবে ফিরে পেল। ১৩২১ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৯১৫ সাল নজরুল আবার ভর্তি হোলেন তাঁর

পুরোনো স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে। কেউ কেউ মাথরুন স্কুলের কথা ভেবে লিখেছেন নজরুল নাকি শিয়ারশোলে এসে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়, তিনি ভর্তি হয়েছিলেন সপ্তম শ্রেণীতে। নজরুলের একটি চিঠির ভাষা শিক্ষকদের আনন্দিত করেছিল, এত উন্নতমানের ভাষা, বক্তব্য প্রকাশের বলিষ্ঠ ভঙ্গী তাঁদের অভিভূত করেছিল এবং এই চিঠিই নজরুলের জন্যে খুলে দিয়েছিল ঐ স্কুলে প্রবেশ করার দরজা। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়ে নজরুল ডবল প্রমোশন পেয়ে একেবারে নবম শ্রেণীর ছাত্র হয়ে গেলেন। আর এখানেই এই কৃতিত্বের দরুণ মাসিক বৃত্তি সাত টাকা আসতে সুরু করলো রাজবাড়ী থেকে। ১৯১৬ সালে এক রচনা প্রতিযোগিতায় নজরুল পেলেন এজ্‌লী পুরস্কার—তাঁর এই নানান দিক থেকে পাওয়া সম্মান ছাত্র-শিক্ষক-স্কুল কমিটি—সকলের কাছেই আদরের হয়ে উঠলো!

কি ভাবছো অনিমেষ? ইতিহাস তো অনেক কথাই লিখে রাখে নি। শিয়ারশোল স্কুলের এক অম্লান ব্যক্তিত্ব, প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত ও সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক প্রভৃতির কথা ভুলে গেলে পাপ হবে অনিমেষ। নজরুল এঁদের কাছ থেকে নিছক আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, তা নয়—যা পেয়েছিলেন তাতে তাঁর প্রাণ অফুরাণ আনন্দে ভরে উঠেছিল। নগেন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়েছিলেন জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা সতীশচন্দ্র দিয়েছিলেন গানের তালিম আর বেদ-পুরাণের শিক্ষা আর নিবারণচন্দ্র দিয়েছিলেন স্বদেশ প্রেমের দীক্ষা, উন্নত শির, অকুতোভয় হবার বীজমন্ত্র। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে কবি তাঁর নানান চিঠি-পত্রে, সাহিত্য আড্ডায় এঁদের কথা, শিক্ষক-কবি কুমুদরঞ্জনের কথা বলেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন এইসব ছাত্র-প্রেমিক আদর্শপুরুষদের কথা।

এই শিয়ারশোল স্কুলেই নজরুল পেয়েছিলেন প্রতিবেশী স্কুলের এক বন্ধুকে, পরবর্তী জীবনে যিনি দীর্ঘকাল নজরুলের অন্তরতম সুহৃদ

হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন নানানদিক থেকে। তিনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নাতি, রাণীগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্র। শৈলজা এসে যোগ দিলেন নজরুলের সঙ্গে, আর এলেন 'ক্রিশ্চান বন্ধু' শৈলেন ঘোষ। তিন বন্ধু—হিন্দু ব্রাহ্মণ, মুসলমান আর ক্রীষ্টান মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, মানুষের তৈরী করা জাতপাতের দুর্বল সেতু এঁরা নিজেদের অজান্তেই ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন সেই ছাত্রবয়সেই। শৈলজানন্দ লিখছেন, 'আমরা তখন পনেরো-ষোলো বছরের কিশোর বালক। রাণীগঞ্জে থাকি। দু'জন দু'টো স্কুলে পড়ি, কিন্তু থাকি খুব কাছাকাছি। এক পুকুরে স্নান করি, সাঁতার কাটি, আম, জাম, কামরাঙ্গা গাছ থেকে পেড়ে নুন দিয়ে দিয়ে খাই, একসঙ্গে বেড়াতে যাই, সুখ দুঃখের গল্প করি। অন্য বন্ধু আছে অনেক। তাদের মধ্যে একমাত্র ক্রিশ্চান বন্ধু শৈলেন ছাড়া আর কেউ বড়ো একটা আমাদের সঙ্গে মেশে না। আমাদের জগৎ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।'

তুমি শুনে অবাক হবে অনিমেষ, তখন সেই ছাত্রবয়সে নজরুল লিখতেন গল্প আর শৈলজানন্দ লিখতেন পদ্য। গল্প লিখতে লিখতে নজরুল যেমন গান লিখতে পারতেন, কবিতা লিখতে পারতেন, শৈলজানন্দ সে সব কিছু লেখার চেষ্টাও করতেন না। পরবর্তীকালে শৈলজানন্দের ভাষায় বলি শোনো—'আমরা এখন আমাদের পেশা বদলে নিয়েছি। আমি লিখছি গল্প আর নজরুল লিখছে কবিতা।' আর জনপ্রিয়তায়? স্কুলের ফুটবল খেলা হবে—ডাকো নজরুলকে, যে কোনও অনুষ্ঠান, নজরুলকে চাই-ই চাই, এমন কি প্রবীণ শিক্ষকের বিদায় সভাতেও নজরুল না হলে চলবে না। ১৯১৬ সালের ১৬ই জুলাই প্রবীণ শিক্ষক ভোলানাথ স্বর্ণকারের বিদায়সভায় অথবা পরবর্তী কিছুকাল পর অন্যতম প্রবীণ শিক্ষক হরিশংকর মিশ্রের বিদায়সভায় নজরুল ইসলাম সেই বয়সেই যে ধরণের উচ্চমানের কবিতা লিখেছিলেন পড়লে তুমি বিস্মিত হবে অনিমেষ। আমি হরিশংকরবাবুর বিদায়-সভার কবিতাটির একটু তোমাকে শোনাই শোনো—

রুচির এসব স্মৃতির প্রীতি, যেয়ো না ভুলায়ে চলি—
পারিবে কি যেতে স্নেহের অযুত বাহু-বন্ধন খুলি' ?
যাও যদি ওগো, লঙ্ঘিতে হবে শিশুর আঁসুর স্রোত,
পারিবে কি ? তবে যাও দেব, রুখিব না তব পথ।
বক্ষ চিরিয়া রুধির রক্ত কলিজা ঢালিয়া মুখে
দাঁড়াই যদি গো পথ আগুলিয়া চাপি অঞ্চল চোখে।
চলে যেতে পার, চলে যাও দেব, কিছু বলিব না আর
হাসিতে হাসিতে ঢেলে দেব শিরে প্রাণের অর্ঘ্যভার।......

মনে রাখতে হবে তখনকার দিনে কবির বয়স, তৎকালীন কাব্যগতি, মাত্র তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র আর এসব ভাবলেই একথা বোঝা সহজ হবে এ প্রতিভা অসাধারণ এক শক্তি, চেষ্টা বা কষ্টকল্পিত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত মননের উজ্জ্বল প্রকাশ॥

এই শিয়ারশোল স্কুলে মৌলবী আবদুল গফুর সাহেবের সঙ্গে নজরুলের কিছুতেই বনিবনা হোত না। 'গফুর সাহেব একদিকে ছিলেন স্কুলের আরবী ফারসী শিক্ষক অন্যদিকে মুসলিম হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না।......ছাত্রদের পাণ্ডা ছিলেন নজরুল। তিনিই ছাত্রদের অগ্রণী হয়ে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতেন। গফুর সাহেবও নজরুলকে দেখতে পারতেন না। সুযোগ পেলেই তাঁর নামে প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ করতেন। নজরুল তাঁর উপর চটেমটে পারসী ছেড়ে সংস্কৃত পড়তে সুরু করেছিলেন।' খ্যাতনামা নজরুল গবেষক ডঃ মিলন দত্তের এই কথার সমর্থন অনেকেই করেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার নজরুলের এই আচরণই তো স্বাভাবিক। শিক্ষাগুরু যদি সাম্প্রদায়িক হন কিম্বা ছাত্রদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন, সেখানে গর্জন করে ওঠার ক্ষমতা একমাত্র নজরুলেরই ছিল।

প্রতিদিনের দুষ্টুমি, দৌড়ঝাঁপ, তারই মধ্যে পড়াশুনা, একটু সময় পেলেই গান কিম্বা গল্প লেখা, তারই মধ্যে একটি ছোট্ট ঘটনা নজরুলের চোখে জল এনে দিল। দালানের কড়িকাঠ থেকে পড়ে যাওয়া এক চড়ুইছানাকে একটি মই এনে দুই বন্ধু, নজরুল আর

শৈলজানন্দ, তুলে দিলেন তার বাসায়, মা-পাখীটির কান্না থামাতে পেরে নজরুল তো দারুণ খুসী। তার পরদিন স্কুল কামাই, আপন মনে নজরুল লিখে ফেললেন এক দীর্ঘ কবিতা—

মস্তবড় দালান-বাড়ীর উইলাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট একটি চড়ুইছানা, কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।
চূ-চা রবের আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে বসন-বায়ে
মায়ের পরাণ—ভাবলে বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছায়ে।
অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটলো মাতা ফড়িং মুখে
স্নেহের আকুল আশীষ জোয়ার উথলে উঠে মার সে বুকে।...

ছাব্বিশ লাইনের এই কবিতাটি খোঁজ করে পড়ে নিও অনিমেষ। নজরুল তখনো বিদ্রোহী কবি বলে চিহ্নিত হন নি, সবেমাত্র কবিত্বের বিকাশ ঘটেছে, তবু কবিতাটির মধ্যে যে দরদী মনকে তুমি আবিষ্কার করবে, যে বিদ্রোহী চেতনাকে তুমি খুঁজে পাবে, তার সাহিত্যমূল্য কম নয়। শৈলজানন্দের মতে, 'এটি নজরুলের প্রথম কবিতা এবং সার্থক কবিতা। বললুম, তোকে আরো লিখতে হবে নজরুল। আর সে লিখল আরো কবিতা।' শৈলজানন্দ আরো লিখলেন, 'কবিতার সেই ক'টি পাতা কেমন করে না জানি আবার আমার কাছে রয়ে গেছে। নজরুলের নিজের হাতের লেখা। নিচে তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়া আছে—১২-৪-১৭ অর্থাৎ ১৯১৭ সালের ১২ই এপ্রিল।'

শৈলজানন্দের কাছে থেকে যাওয়া সেই অপ্রকাশিত কবিতাগুলির একটির নাম 'রাজার গড়', চুরুলিয়ার রাজা নরোত্তম দাসের গড়কে কেন্দ্র করে এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল, জননী জন্মভূমি চুরুলিয়া হয়তো একদিন ছিল 'লোক-মুখরিত বিরাট বিশাল নগরী', হয়তো সেদিন 'বিলাস বিতানে বেড়াত যুবতী এলায়ে অলস কবরী', হয় তো ছিল দীন দরিদ্র মানুষের ওপর অত্যাচার, কিশোর-কবির বেদনাবিধুর মন কেঁদে উঠেছিল তাদের জন্যে আর সেইসঙ্গে লুণ্ঠিতা ছিন্নবসনা স্বদেশ জননীর জন্যেও। এই মানসিকতার কবি যে উত্তর জীবনে লক্ষ মানুষের প্রিয় কবি হয়ে উঠবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। লোভ হচ্ছে, সব

কবিতাটাই তোমাকে শোনাই, কিন্তু শোনো একটু অংশবিশেষ—

কে তুমি আমার পল্লীমায়ের দুখেরি কাহিনী কহিছ?
নীরব নিঝুম গভীর ব্যথাটি বহিছ?
মা নাকি ছিল রাজার দুলালী
আজ অনাথিনী পথের কাঙ্গালী
স্মৃতির আগুন বুকে চাপি বুঝি ধিকিধিকি তাই দহিছ?
শত বরষের পুঞ্জিত জ্বালা বুক পেতে নিজে সহিছ।

আজ অনেক কিছুই হারিয়ে গিয়েছে অনিমেষ। আবার অনেক অপ্রকাশিত লেখা অযত্নে পড়ে আছে কারোও কাছে, কেউ হয়তো নীলামের স্বর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। হারিয়ে গিয়েছে কত স্মৃতি, কত উজ্জ্বল উচ্ছল মুহূর্ত। আমার সহপাঠী বন্ধু, নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক ও সুকবি, বিদ্রোহী কবির ভাইপো কাজী রেজাউল করিম বলছিলো তার অন্তরযন্ত্রণার কথা, বলতে বলতে চোখ দু'টো আগুন হয়ে উঠেছিল সেদিন, আমাদের অবহেলা, আমাদের ঘুমন্ত চেতনার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে রেজাউল বললে, 'তুই দেখে নিস্, এমন একদিন আসবে, যেদিন সমগ্র জাতিকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।' কথাটা ঠিক অনিমেষ, আমরা সেই মুহূর্তটির জন্য সাগ্রহে তাকিয়ে থাকবো সেদিন সর্বস্তরে নতুন করে নজরুল-ভাবনার ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠবে।

১৯১৭ সালের আগষ্ট মাস। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ আগুনের মত লেলিহান শিখায় গ্রাস করেছে রণভূমি। সৈনিক নেওয়া হচ্ছে পরাধীন ভারতবর্ষ থেকেও। আর এই ১৯১৭ তেই সৈন্যবাহিনীতে প্রথম গঠিত হোল বেঙ্গলী ডাবল কোম্পানী, পরে এর নাম হোল উনপঞ্চাশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট। আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে সৈনিক সংগ্রহের ধুম পড়ে গেল। আর যুদ্ধ করার উন্মাদনা, সৈনিক হবার ইচ্ছায় নজরুলের মনের ভেতর তখন উথাল পাথাল, দূর ডেকেছে বাঁধনছেঁড়াকে, কাজেই দশম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হোলো না, টেষ্ট পরীক্ষা চুলোয় যাক, নজরুল মনে মনে তৈরী হলেন, যুদ্ধে যেতেই হবে।

প্রেম চুপিসারে আসে, মনকে ছুঁয়ে যায় কখন কে জানে। টগবগে স্বাস্থ্য, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল সুদর্শন কবির মনে তখন ব্যর্থ-প্রেমের জ্বালা। ভালবেসেছিলেন একটি হিন্দু ব্রাহ্মণ মেয়েকে, মেয়েটিও মেলে দিয়েছিল তার কালো হরিণ চোখ, কিন্তু পরিণতি পেল না সেই ভালবাসা—দশম শ্রেণীর ছাত্র, তাতে মুসলমান আর হিন্দুর ভালবাসা, বাধা এলো তীব্রবেগে। যুদ্ধে চলে যাবার পেছনে এই ঘটনাও অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিল নজরুলকে।

শৈলজানন্দ লিখছেন, 'শহরে তখন নিত্য নতুন পোষ্টার পড়ছে।... কত বিচিত্র তার ছবি, কত বিচিত্র তার ভঙ্গী, কত বিচিত্র তার ভাষা।...কে বলে বাঙ্গালী যোদ্ধা নয়? ঝাঁপিয়ে পড় সিংহবিক্রমে। বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দাও। দুর্নাম ঘুচুক।'

নজরুল কিন্তু এসব পোষ্টারী-ভাষায় ভুললেন না। তিনি শৈলজানন্দকে বোঝালেন, পরাধীন ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হলে ওদের কাছেই আধুনিক রণনীতি শিখে নিতে হবে, তারপর ওদেরই অস্ত্রে নিধন করতে হবে এদের লোলুপ আগ্রাসী ভাবনাকে, স্বাধীনতা চাই। আজন্ম শোষণ বিরোধী, দুর্দম, দুর্বার নজরুল, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি তীব্র ঘৃণায়, স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনার বাসনায় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে ছিল তাঁর জীবনে প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার জ্বালা, অভাব, পলায়নী মনোভাব। না অনিমেষ, তুমি আমার এই শেষ কথাটার অপব্যাখ্যা কোরো না, আমি কবিকে জীবন থেকে পলাতক—একথা বলি নি, আমি বলতে চেয়েছি স্থান থেকে স্থানান্তরে, অচেনাকে চেনার আনন্দে, সীমা থেকে অসীমে ছুটে যাওয়ার কথা, নজরুলের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে উত্তরজীবনেও আমরা তা লক্ষ্য করেছি।

শৈলজানন্দও কোমর বাঁধলেন যুদ্ধে যাবেন বলে। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসের একরাতে বন্ধুদের উল্লসিত শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন মাথায় নিয়ে নজরুল আর শৈলজানন্দ রওনা হোলেন কলকাতায়—রাত বারোটার ট্রেনে। সেদিন রাণীগঞ্জ স্টেশনে অজস্র মানুষের

ভীড় দামাল এই দু'টি ছেলেকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য। আর সঙ্গী হোলো ভবঘুরে ডুগিয়া, সেও যাবে যুদ্ধে। কলকাতায়, শৈলজানন্দের আত্মীয়বাড়ী ৭১নং সুকিয়া স্ট্রীটে ভোরবেলায় এসে পৌছালেন তাঁরা, আর স্নান খাওয়া সেরেই হেদোর উত্তরে মল্লিকবাড়ী রিক্রুটিং অফিসে পৌঁছে গেলেন তাড়াতাড়ি।

শৈলজানন্দের চতুর মাতুলের কায়দায় আন্‌ফিট হলেন শৈলজানন্দ, কিন্তু নজরুলকে সঙ্গে সঙ্গেই সৈনিক শিক্ষার্থীদলে ভর্তি করে নেওয়া হোল। আর ডুগিয়াও পেল সুইপারের চাকরী। ডঃ মিলন দত্তের ভাষায়, 'পিছনে পড়ে রইল মা ভাইয়েরা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন লেটোর দল আর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্কলারশিপের সম্ভাবনা আর ব্যর্থ প্রেমের সেই নিষ্ঠুর বেদনার্ত স্মৃতি।' মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বলেছেন, 'স্কুলের ভালো ছাত্র হওয়া স্বত্বেও মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করার চেয়ে সে দেশপ্রেমকেই উচ্চাসন দিয়েছিল। বেঙ্গলী ডাবল কোম্পানীতে যোগ দেওয়ার সে ডাক তার কানে পৌছেছিল সে ডাককে দেশপ্রেমের ডাক ধরে নিয়েই সে তাতে যোগ দিয়েছিল।'

যুদ্ধে যেতে না পারার লজ্জায়, নজরুলের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনায় শৈলজানন্দ ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর রাণীগঞ্জ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। শৈলজা লিখেছেন, 'আমি কিন্তু আর রাণীগঞ্জে ফিরে যাই নি। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারি নি সেখানে।'

নজরুল যুদ্ধে চলে গেলেন। তাঁদের ট্রেনিং সুরু হোলো পেশোয়ার জেলার নৌশেরা শহরে আর তারপর ৪৯নং বেঙ্গলী রেজিমেন্টের সদরদপ্তর করাচীতে ব্যারাকে তাঁকে পাঠানো হোলো, স্বল্প সময়ের মধ্যেই নজরুল ল্যান্স নায়েক পদ থেকে কয়েকধাপ অতিক্রম করে কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হোলেন।

অনিমেষ, আমাদের দেশে কল্পনাবিলাসী লেখকের অভাব নেই—এঁরা হয় কে নয়, নয় কে হয় করতে জানেন। কেউ কেউ লিখতে বসলেন রূপকথা—নজরুল সম্পর্কে লিখলেন অবাস্তব কল্প-কাহিনী। মেসোপটেমিয়ায় নাকি নজরুল একনাগাড়ে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেছিলেন,

এমন অনেক গল্প শোনালেন আমাদের। অথচ তুমি জেনে রাখো, নজরুল কোনদিনই প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেন নি, করার প্রয়োজনও হয় নি আর মেসোপটেমিয়া পর্য্যন্ত তাঁকে যেতেও হয়নি। তিনি করাচী ব্যারাকে বসে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কাজ করতেন আবার আপদে বিপদে বুদ্ধিচাতুর্য্যে সহযোগীদের কঠোর শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতেনও। মজার ব্যাপার, প্রত্যক্ষ যুদ্ধ না করেও নজরুল এমন কিছু গল্প লিখেছেন, যাতে মনে হয় তিনি বুঝি দারুণ যুদ্ধ করছেন, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতা নিজের চোখে দেখছেন আর এর ফলেই রূপকথা কল্পকথার সৃষ্টি হয়েছে তাঁকে ঘিরে। এ প্রসঙ্গে নজরুল-সহযোগী জমাদার শম্ভু রায়ের একটি লেখা 'বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের কোনও সৈনিককেই গুলি বারুদের মধ্যে যুদ্ধ করতে দেওয়া হয় নি।'

যেখানে নজরুল, সেখানেই চঞ্চল সমীরণে লাগে আনন্দের ছোঁয়া, গুলবাগিচায় ফুল ফোটার উৎসব সুরু হয় সবার অজান্তে। করাচী সেনানিবাসেও নজরুলের ঐকান্তিক আগ্রহে প্রায় রোজই বসতো গান বাজনার আসর আর মাঝে মধ্যেই সাহিত্য-আড্ডা চলতো গভীর রাত পর্য্যন্ত। হারমোনিয়ম, কর্নেট, ব্যাঞ্জো, ক্ল্যারিওনেট যোগে গান বাজনার মধ্যে মধ্যেই গলা কাটিয়ে নজরুলের সঙ্গে সবাই কোরাস ধরতো, 'চালাও পান্‌সী বেলঘরিয়া' কিম্বা 'ঘি চপচপ কাবলী মটর' অথবা 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এইসব কথা বলে। এর মধ্যে 'দে গরুর গা ধুইয়ে' কথাটি এখনও খোসনগর, কেলেজোড়া, চুরুলিয়া, দোমোহানী অঞ্চলে জনপ্রিয় প্রবাদ বাক্যের মত ব্যবহৃত হয়, আমিও বলি, তুমিও বলো।

মদের নেশার চেয়েও যদি আরো তীব্র কোনও নেশা থাকে, তা হোলো বইপড়ার নেশা আর ছোটবেলা থেকেই বই-নেশায় মাতাল ছিলেন নজরুল। চাওয়ায় যদি আন্তরিকতা থাকে, পাওয়ার বাধা থাকে না, বিশেষ করে বই, পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে—নজরুলের কাছেও ক্রমশঃ সব পত্র-পত্রিকাই সহজলভ্য হয়ে উঠলো, ব্যাপক অধ্যয়ন ও লেখার সুযোগ পেলেন তিনি। খাকী পোষাকের পর্বতপ্রমাণ স্তূপের আড়ালে বসে তখন তিনি একের পর এক পড়ছেন শরৎ সাহিত্য,

রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বই, পড়ছেন প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মর্মবাণী, মানসী, সবুজপত্র, এমন কি গোপনে জোগাড় করছেন নিষিদ্ধ বই, পত্র-পত্রিকাও। ভয় নেই, বাধার কাছে আত্মসমর্পণ নেই, দ্বিধাহীন অকুতোভয় নজরুল তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করছেন সাহিত্যের বিশ্বখনি থেকে মণি, মুক্তা, হীরে, মাণিক আর তারই ফাঁকে শিখছেন অর্গান বাজিয়ে গান করতে, আর সেনানিবাসে পাঞ্জাবী মৌলভীর কাছে ফারসী, শুনছেন দিওয়ান-ই হাফিজ এবং অন্যান্য ফারসী কাব্যগাথা। পরবর্তীকালে রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের অনুবাদ করতে পেরে নজরুল তৃপ্ত হয়েছিলেন।

কলকাতায় তখন একটি শক্তিশালী ত্রিমাসিক পত্রিকার জন্ম হয়েছে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' নামে একটি সংগঠনের অন্যতম নেতা তখন মুজফ্‌ফর আহমদ। সমিতির অফিস ছিল ৪৭/১ মির্জাপুর স্ট্রীটে। এই সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বাংলা ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাস, ইংরাজী ১৯১৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে এই পত্রিকাটির আবির্ভাব আর যোগ্য পরিচালনায় জন্মলগ্ন থেকেই জনপ্রিয়তা কুড়োতে সুরু করেছিল। নজরুল সেই সুদূর করাচী থেকে এই পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন।

অনিমেষ, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করবে বলে ভাবছো সেটা আমি আন্দাজ করতে পারছি। খুব সম্ভব তোমার মনে জনাব মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্বন্ধে কিছু চাপা কৌতূহল ঘোরাফেরা করতে সুরু করেছে। আমি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার তাঁর কথা বলেছি এটা তুমি লক্ষ্য করেছ এবং এক্ষেত্রে কৌতূহলী হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক। নজরুল আর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর নাম চিরকাল একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে, ইতিহাসে একজন চিহ্নিত থাকবেন জনগণের শাশ্বত কবি হিসেবে, আর একজন এই কবিকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন, সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে থেকেছেন অপরদিকে শোষিত মানুষের বুকে আশার আলো জ্বেলেছেন—সেইজন্য স্মরণীয় হয়ে

থাকবেন।

বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল পত্রালাপে, পরে নিবিড় হোলো চোখের দেখায়। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালে জুলাই-আগষ্ট মাসের সংখ্যাটিতে নজরুল ইসলামের একটি কবিতা 'মুক্তি' নামে প্রকাশিত হয়। নজরুল এর নাম রেখেছিলেন 'ক্ষমা' কিন্তু সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে কবিতাটির নাম বদলে 'মুক্তি' নাম দিয়ে ছাপা হয় মুজফ্ফর আহ্মদের একান্ত ইচ্ছায় এবং তিনি বলেছেন, 'এটিই ছিল তার প্রথম পত্রিকায় ছাপানো কবিতা। তার আগেও সে অনেক কবিতা লিখেছে, কিন্তু এটিই প্রথম ছাপা হয়েছিল।'

কবিতাটি দীর্ঘ, তুমি পড়ে নিও অনিমেষ। নজরুল তাঁর প্রথম ছাপা কবিতা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন এবং ১৯১৯ এর ১৯শে আগষ্ট এক চিঠি লিখেছিলেন সম্পাদকীয় দপ্তরে যার প্রথম কথাটি ছিল '……আমার নগণ্য লেখাটি আপনাদের সাহিত্য পত্রিকার স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছি বেশী।' এই চিঠির সঙ্গে একটি 'লম্বা চওড়া গাথা আর একটি দীর্ঘ গল্প' পাঠালেন বলে লিখেছিলেন নজরুল, কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, গাথা আসে নি, এসেছিল তাঁর বিখ্যাত 'হেনা' গল্পটি, যেটি ১৯১৯ অক্টোবরেই প্রকাশিত হোল বিশেষ মর্য্যাদার সঙ্গে।

ক্রমে কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নজরুল তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র তৈরী করে নিলেন। একে একে প্রকাশিত হতে লাগল বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী, কবিতা সমাধি, ব্যথার দান, স্বামীহারা, আশায় প্রভৃতি গল্প বা কবিতাগুলি, সাহিত্য সংগ্রামীদের পাশে এসে পৌঁছালেন নজরুল এবং তার অব্যবহিত পরেই এমন এক দিন এলো, যেদিন নজরুল জনপ্রিয়তার শীর্ষে, মুখে মুখে উচ্চারিত, চোখে চোখে তাঁকে দেখার আগ্রহ, কবিতা পড়ার জন্য কাড়াকাড়ি, মারামারি—গর্বে বুক ভরে ওঠে, আমাদের প্রিয়তম কবির এই জনপ্রিয়তার প্রথম দিনটিকে যেন মানসনেত্রে দেখতে পাই অনিমেষ, সারা শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। চিরস্মরণীয় সেই 'বিদ্রোহী' কবিতার কথা তোমাকে

আর একটু পরে শোনাবো, আগে শোনো সৈনিক নজরুলের করাচী থেকে চলে আসার ইতিবৃত্ত।

তখন ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেবার কথা চলছে। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে সাতদিনের ছুটিতে এলেন নজরুল, সোজা কলকাতায় এসে দেখা করলেন বন্ধু শৈলজানন্দের সঙ্গে। শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখছেন শৈলজা। বন্ধুরা একে অপরকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শৈলজানন্দ লিখেছেন, 'চমৎকার চেহারা হয়েছে নজরুলের। মাথায় চুল রেখেছে, বুকের ছাতি হয়েছে চওড়া, পায়ে বুট জুতো, খাকি প্যান্ট, খাকি সার্ট—মানিয়েছে সুন্দর।' শৈলজানন্দ নিয়ে গেলেন নজরুলকে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে, দেখলেন মুজফ্ফর আহ্মদকে। তাঁর নিজের লেখায়, 'গিয়ে দেখলাম—অপূর্ব সুন্দর এক মানুষ। গৌরবর্ণ শীর্ণকায় সংযতবাক যে যুবকটিকে সেদিন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, আজও তিনি আমার স্মৃতিপটে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।' আর নজরুলকে দেখে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখলেন, 'কাজী নজরুল ইসলামকে সেদিন আমি প্রথম দেখলাম। সে তখন একুশ বছরের যৌবনদীপ্ত যুবক। সুগঠিত তার দেহ আর অপরিমেয় তার স্বাস্থ্য। কথায় কথায় তার প্রাণখোলা হাসি। তাকে দেখলে তার সঙ্গে কথা বললে যে কোন লোক তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। আমার সঙ্গে তার অনেক কথা হলো।'

কলকাতায় দিন তিনেক কাটিয়ে নজরুল চলে যান চুরুলিয়ায়, তাঁর মায়ের সঙ্গে, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে, সেখান থেকে আবার করাচী, আসন্ন বিদায়ের আগে ব্যারাকের সকলের সঙ্গে দেখা করতে কিম্বা সৈনিক জীবনের সমাপ্তিরেখা টানতেই হয়তো বা।

—০—

দুই

এখন অনেক রাত। নীল আকাশে তারা মিটমিট জ্বলছে, উদাসী চাঁদের মুখে অনন্ত ভালবাসার ছবি। তুমি বোধহয় অনেক কিছুই ভাবছো অনিমেষ। অজয়ের জলে চাঁদ খেলা করছে আপন মনে, অদূরে ঘুমিয়ে চিচুরবিল, বড়কোলা, দেশেরমোহন, নিস্তব্ধ এই সময়েই তো সেই মহান পুরুষকে মনে করার লগ্ন। অনিমেষ তুমি তো জানো আমি তোমাকে কোনও রূপকথার গল্প বলি নি, বলেছি ঝড়ে জলে বাদলে রোদে ছুটে বেড়ানো, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অবিস্মরণীয় করে রাখার প্রচেষ্টায় লড়াকু এক অসাধারণ চরিত্রের কথা। তুমি গভীর শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করেছ, বুঝতে চেয়েছ, আর প্রমথনাথ বিশীর সেই মূল্যবান কথাটিও নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়েছে যে তথাকথিত নজরুল প্রেমিক কিম্বা জীবনীকারদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'সাহিত্য বিচারের মধ্যে রাজনীতির স্থূল হস্ত প্রবিষ্ট হওয়াতেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।...কবিকে নিয়ে যারা সংকীর্ণ রাজনীতির খেলায় মেতেছেন, তাঁরা না কবির অনুরাগী, না সাহিত্যের।' ঠিক কথাই বলেছেন তিনি। সকল সংকীর্ণতার উর্ধে যে মানুষটি জাতপাতের লড়াইকে টান মেরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যে মানুষটি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গণজাগরণের গান শুনিয়েছিলেন, একমাত্র কবি—যিনি মৃত্যুর পরোয়া না করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ঘোষণা করেছিলেন, যিনি ক্লীবত্ব আর তথাকথিত রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, তাঁর সাহিত্যবিচার করতে বসে অনেককেই শ্যাম রাখি না কূল রাখি ভাবনায় ভাবিত হতে দেখেই প্রমথনাথ বিশী একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে গিয়েছিল বলেই আমরা নজরুলকে নতুন করে পেয়েছিলাম এবং কাছের মানুষ করে নিতে পেরেছিলাম।

সৈনিক নজরুল রণাঙ্গন ছেড়ে চলে এলেন, এসে উঠলেন কলকাতায়। ১৯২০ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হল। নজরুল এসে উঠলেন রামকান্ত বোস স্ট্রীটে, শৈলজানন্দের বোর্ডিং হাউসে। কিন্তু দু'তিন পরেই তীব্র আপত্তি উঠলো হিন্দু বোর্ডিং-এ মুসলমানের প্রবেশ নিয়ে। শৈলজানন্দ নজরুলকে অন্যত্র জায়গা দিতে চাইলেন, কিন্তু নজরুল এলেন ৩২, কলেজ স্ট্রীটে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে আর এসেই পেলেন প্রাণের চেয়েও প্রিয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে, তাঁরই ঘরে আর একখানা তখৎ পোশ পাতা হল নজরুলের জন্যে।

এক একটা মুহূর্ত আসে অনিমেষ, যাকে আমরা কেউ-ই কখনো, কোনদিনই ভুলতে পারি না। নজরুলের জীবনের প্রথম লগ্নে যে ভালবাসার ফুল ফুটেছিল, তার বেদনা তিনি সারা জীবন ধরে বহন করেছেন, রাণীগঞ্জ থেকে করাচী সেনানিবাস হয়ে সেই প্রেমাতুর স্মৃতি নিভৃত গোপনে ফিরে এসেছে কলকাতায়—তাঁর সঙ্গের বাক্স বিছানার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। অ-ধরা সেই প্রথম প্রেমিকার চুলের ছোঁয়া লাগা মাথার একটি কাঁটা হচ্ছে সেই পরমপ্রিয় স্মৃতিচিহ্ন। কলেজ স্ট্রীটে সমিতির অফিসে তার বাক্স-বিছানা খুলে বন্ধুরা যা দেখতে পেয়েছিলেন, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে, 'তাতে তার লেপ, তোশক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি (আচ্‌কান), ট্রাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি যা তখনকার দিনে করাচীর লোকেরা পরতেন। একটি দূরবীনও (বাইনোকুলার) ছিল। কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইতাদিও ছিল। পুস্তকগুলির মধ্যে ছিল ইরাণের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল পার্সির প্রতি ছত্রের নীচে উর্দু তর্জমা দেওয়া ছিল।' দুঃখপ্রকাশ করে তিনি আরো লিখেছেন, 'অনেক দিন পরে আমারই কারণে নজরুল ইসলামের এই গ্রন্থখানা, আরও কিছু পুস্তক, কিছু চিঠিপত্র, অনেক দিনের

পুরানো কবিতার খাতা, বিছানা, কিট ব্যাগ, সুটকেস্ এবং 'ব্যথার দান' পুস্তকের উৎসর্গে বর্ণিত মাথার কাঁটা খোয়া যায়। মিউজিয়মে রক্ষিত মূল্যবান বস্তুর মতো নজরুল এই কাঁটাটিও রক্ষা করে আসছিল।'

নজরুল তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ব্যথার দান' এর উৎসর্গে লিখেছিলেন—

মানসী আমার!
মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে
ক্ষমা কর নি,
তাই বুকের কাঁটা দিয়ে
প্রায়শ্চিত্ত করলুম।'

ব্যথার দান বইটি বার হয়েছিল ১৯২০ সালে। ১৯২১ থেকে 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাস। ইতিমধ্যে এক ব্যাপার ঘটে গেল। আফজালুল হক, মোসলেম ভারতের যিনি সম্পাদক, তিনি নজরুলকে এক চুক্তিতে বাঁধতে চাইলেন। নজরুল যা লিখবেন, 'মোসলেম ভারত'কে দিতে হবে এবং এর জন্য তিনি একশো টাকা করে মাসিক পারিশ্রমিক পাবেন। নজরুল মেনে নিয়েছিলেন, কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকতে হলে একটা আশ্রয় হিসাবে মোসলেম ভারত তাঁর কাছে তখন অনেক মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। মুজফ্ফর আহ্মদ বলছেন, 'কী সৌভাগ্য নূতন মাসিক 'মোসলেম ভারত' কাগজখানা বার হওয়ার মুখেই কাজী নজরুল ইসলামের মতো একজন উদীয়মান কবিকে প্রায় বাঁধা লেখক হিসাবে পেয়ে গেল। আর নজরুল ইসলামও, তার সৌভাগ্য বলতে হবে যে তার কবিতার স্রোত বইয়ে দেওয়ার জন্য নূতন হলেও একখানা প্রথম শ্রেণীর মাসিক তার হাতের মুঠোয় আপনা আপনি এসে পড়ল।'

একুশ বছরের তরুণ এলেন আর জয় করলেন মানুষের মন। এক-দিকে তাঁর আলাপ জমাবার ক্ষমতা, মনের প্রসারতা, জাতপাতের বিরুদ্ধে মাথা তোলার মানসিকতা, অন্যদিকে অফুরান সাহিত্য রচনার ক্ষমতা তাঁকে জনপ্রিয় করে তুললো। কঠোর সমালোচক মোহিতলাল

মজুমদার, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নজরুলের সাহিত্যকীর্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাগত জানালেন। আর এসো আমরা নজরুলের ভাষাতেই বলি—

'বীণাপাণির সুর-মহলের কোন্ দুয়ার আজ খুললো রে
কোন্ সুখে আজ মন আমাদের দোদুল-দোলায় দুললো রে।'

এই প্রসঙ্গে ডঃ মিলন দত্ত লিখছেন: 'সাহিত্যচর্চা ছাড়াও নজরুল এই সময় কলকাতায় গায়ক হিসাবেও পরিচিতি লাভ করছিলেন। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও গান শোনাবার জন্যে তাঁর ডাক পড়ত। শিক্ষিত সমাজ থেকে সুরু করে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের সমাজ, সর্বত্র ছিল তাঁর অবাধ গতি। একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ তাঁর গান শুনতে আগ্রহী ছিল, অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলের কৃষকরাও মুগ্ধ হয়ে তাঁর গান শুনতো।'

আজ এই চুরুলিয়ার পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে অনেক আগে হারিয়ে যাওয়া একটি বেদনাঘন দিনের কথা মনে পড়ছে অনিমেষ। মায়ের কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছিলেন নজরুল। বুকভরা যন্ত্রণা আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন চুরুলিয়া থেকে, আর আসেন নি। অনেকদিন পর দাদা সাহেবজানও কলকাতায় গিয়ে নজরুলকে ফিরে যাবার জন্য সাধ্য সাধনা করেছিলেন, তবুও ফেরেন নি তিনি। মায়ের সঙ্গে মান-অভিমান তীব্র আকার ধারণ করেছিল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সেই যে তিনি চলে এলেন, জ্ঞানে আর কখনোও চুরুলিয়ার মাটিতে পা রাখেন নি। চুরুলিয়ার মানুষ তারপর কবিকে চুরুলিয়ায় দেখেছে দু'বার, একবার ১৯৫৬ সালের জুন মাসে, মন্মথ রায়ের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম তোলার সময় আর দ্বিতীয়-বার দেখেছে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে তাঁর স্ত্রী প্রমীলা ইসলামের মৃত্যুর পরে। কিন্তু তখন তিনি তো নির্বাক, বেদনার প্রতিমূর্তি। আমরা চুরুলিয়া হাই স্কুলের ছেলেরা তখন সকাল থেকে সন্ধ্যে ঘুরঘুর করতাম, নির্বাক কবির কাছে কাছে ঘুরে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ পেলে হাতে স্বর্গ

পেতাম। মিহিজামের প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই আসতেন, শুনেছিলাম কবির চিকিৎসা করছেন পরীক্ষামূলকভাবে। অনিমেষ, সেই ছেলেবেলায় দেখা স্বর্গীয় অগ্নিশিখাকে আজো আমি মনে করতে পারি, মনে পড়ে যায় কাছে থেকে দেখা অনেক খুঁটি-নাটি ব্যাপার, অনেক ঘটনা।

সে সব কথা তোমাকে অন্যসময়ে বলবো। ফিরে যাই অভিমানী কবির সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের কলকাতায়। এই কলকাতা, শিল্পীর স্বপ্ন, কবির ধ্যানক্ষেত্র, সাহিত্যিকের সাধনভূমি হয়ে যুগে যুগে বন্দিত হয়েছে। কলেজ স্ট্রীট সেই স্বপ্ন, ধ্যান, মগ্ন সাধনাকে রূপ দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে; খ্যাতি দিয়েছে। নজরুলের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হোলো না, ৩২নং কলেজ স্ট্রীট নজরুলকে হারিয়ে যেতে দিল না, অভিমানীর চোখের জল মুছিয়ে আপন করে নিল আরো গভীরভাবে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ভালবাসা আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠলো।

কলকাতায় ফিরে এসে নজরুল যে শুধুমাত্র 'মোসলেম ভারতে'ই লিখছিলেন তাই নয়, 'সওগাত', 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রপত্রিকাতে চুটিয়ে লিখতে সুরু করলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে অভিনন্দন জানালেন প্রাণভরে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নজরুলের প্রশংসা, অভিনন্দন-পত্র প্রকাশিত হতে লাগলো। আর রবীন্দ্রসংগীত প্রায় সবগুলিই নজরুলের কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি যখন তখন যে কোনও সভাসমিতিতে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন দরদ দিয়ে, এইজন্যে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে 'রবীন্দ্রসংগীতের হাফিজ' বলতেন। অর্থাৎ কোরাণ পাঠের দক্ষ পণ্ডিতের সঙ্গে তুলনা করে এই আদরের উপাধি দিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর বন্ধুরা।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। নজরুল যেদিন প্রথম ৩২, কলেজ স্ট্রীটে এসে উঠেছিলেন, তার কিছুদিনের মধ্যেই আব্‌ আজ্‌হার মুহম্মদ কলীম ওরফে মঈনুদ্দীন হুসয়ন সাহেব একটি রেজিস্ট্রি খামে ভরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের কাছে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নজরুলকে দেবার জন্য। নিঃসন্দেহে তখনকার দিনে

এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং নজরুলের সাহিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার আগেই এই আর্থিক সহযোগিতা নজরুলকে রীতিমত উৎসাহিত করেছিল। এই মঈনুদ্দীন সাহেব ছিলেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য, তিনি জানতেন উনপঞ্চাশ বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট ভেঙ্গে গেলে নজরুল এখানে আসবেন কিন্তু কেউ জানতো না দূরদর্শী এই মানুষটি নজরুলকে মনে মনে কত ভালবাসতেন।

ইতিমধ্যে সমগ্র দেশ তখন সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারে ক্ষুব্ধ, জর্জরিত। দেশের রাজনৈতিক জীবন তখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী চেতনায় ভারতবর্ষ তখন উত্তাল। মুজফ্ফর আহ্মদ লিখছেন: 'তাপের ওপরে চড়ালে জল যেমন টগবগ করে ফোটে, দেশের বিক্ষুব্ধ মানুষও সেইরকম টগবগ করে ফুটছিল। পাঞ্জাবে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছিল সেই কথা দেশের জনসাধারণ তখনও ভোলেন নি। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইন দেশের লোকেরা মেনে নিতে চাইছেন না কিছুতেই।' বস্তুতঃ সেই এক সময়, যখন সারা দেশে তরুণ তরুণীরা দেশের স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনতে অকাতরে প্রাণ বলিদান দিচ্ছে, অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নির্বিচারে গণহত্যা করছে, শোষণ আর শাসনের নিষ্ঠুরতায় ক্ষতবিক্ষত স্বদেশজননী, তখন নজরুলের চিন্তাভাবনায় আগুন জ্বলছে, তিনি পথ খুঁজছেন চতুর্দিকে।

ঠিক এই সময়েই রাশিয়ায় গণবিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ। শ্রমিক সমাজে নব জাগরণের গান, সুরু হয়েছে নানান ধর্মঘট। সেই হাওয়া ভারতের সংগ্রামী চেতনাকে নাড়া দিয়েছে তীব্রভাবে। মুজফ্ফর আহ্মদ এবং সঙ্গীরা এবার সক্রিয় রাজনীতিতে নামার কথা ভাবলেন। রাতারাতি এক ঘরোয়া সভা ডাকা হোল, যোগ দিলেন কবি সাংবাদিক মুহম্মদ ওয়াজিদ আলি, ফজলুল হক সেলবর্সী, মঈনুদ্দীন হুসয়ন, আর বসলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং মুজফ্ফর আহ্মদ। অনেক তর্ক বিতর্ক, আলাপ আলোচনার পর স্থির হোলো ২০ ইঞ্চি × ২৬ ইঞ্চি

সাইজের একটি সান্ধ্য-দৈনিক প্রকাশ করা হবে এবং তার নাম রাখা হবে 'নবযুগ।' যেমন ভাবা তেমন কাজ, দু'চারদিনের মধ্যেই 'ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এক হাজার টাকা জমা দিয়ে মুহম্মদ ওয়াজিদ আলি সাহেবের নামে ডিক্লেয়ারেশন নেওয়া হোল।' ফজলুল হক সাহেবের ভাঙ্গা প্রেসকে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করানো হোল, ছ'পয়সা দিয়ে এক পাউণ্ড রয়াল সাইজের নিউজপ্রিন্ট কেনা হোল আর তারপর নিয়ে আসা হোল নুটবিহারী রায় নামে এক কম্পোজিটরকে। সব বাধা কাটিয়ে নবযুগ প্রকাশিত হোল কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহ্মদ-এর যৌথ সম্পাদনায়, ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই তারিখে। সে কি উন্মাদনা, সে কি আনন্দ সেদিন, নবজাত 'নবযুগ'কে নিয়ে সে কি উচ্ছ্বাস। প্রথম সংখ্যার দাম হয়েছিল এক পয়সা, হিন্দু-মুসলমান সকলেই কিনলেন সেই কাগজ, নজরুলের জোরালো লেখায় প্রথম দিনেই কাগজ জনপ্রিয়তা অর্জন করলো আর সরকারী বাঁকা দৃষ্টিতেও 'নবযুগ' এর নাম চিহ্নিত হয়ে গেল।

অনিমেষ, সেই চেতনাদীপ্ত উজ্জ্বল রৌদ্রতেজে ভরপুর দিনগুলির কথা ভাবলেও গর্ব হয়, বুক ভরে ওঠে আনন্দে। সারা দেশ তখন যৌবনের দীপ্ত গরিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, অকুতোভয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখছেন জ্বালাময়ী গান কবিতা ও সম্পাদকীয়, নেতারা জাতির সামনে দিচ্ছেন সংগ্রামের দীক্ষা, আহ্বান দিকে দিকে শৃঙ্খলমুক্তির। নবযুগ পত্রিকার উদ্বোধনী সম্পাদকীয়তে নজরুল যেন শঙ্খনাদ করলেন—

'আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহাআনন্দের দিন, আজ মহা-মানবতার মহাযুগের মহা উদ্বোধন। আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদ সাগরে নিদ্রিত নন। ...ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খলমুক্ত হইবে। তাহারা কারাগৃহ ভাঙ্গিবে। ঐ শোনো, মুক্তি পাগল মৃত্যুভয়ে ঈশানের মুক্তি বিষাণ...দাঁড়াও, জন্মভূমি জননী আমার! একবার দাঁড়াও! যেদিন তুমি সমস্ত বাধাবন্ধনমুক্ত মহা মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে

সংকোচ দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ, ঝাঁঝরাপারা বক্ষ, স্থত শোনিতলিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না। ....সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মতো উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো।'

এ যেন জাতির ঘুমন্ত চেতনায় তীব্র কশাঘাত। ঘরে ঘরে আলোচিত হতে লাগলো নবযুগের কথা, তেজদৃপ্ত সম্পাদকীয়ের কথা। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে নজরুল লিখলেন 'গেছে দেশ দুঃখ নাই', 'আবার তোরা মানুষ হ', 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সম্পাদকীয়। অগ্নিবর্ষী এই সব লেখায় একদিকে যেমন দেশের মানুষের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জ্বলে উঠলো আগুনের মত, অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হয়ে উঠলো 'নবযুগ'কে উৎখাত করার জন্যে। নজরুলের বিখ্যাত এক সম্পাদকীয় থেকে কয়েকটি ছত্র শোনো অনিমেষ, আজও তোমার রক্ত গরম হয়ে উঠবে। 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে নজরুল লিখলেন—

'...কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না। আঘাত খাইয়া অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই! আমরা কি মানুষ নই? ...স্বাধীনতাকে, মনুষ্যত্বকে এমন নির্মমভাবে দুইপায়ে মাড়াইয়া চলিবে আর কতদিন? এই অত্যাচারের, এই মিথ্যার বনিয়াদে খাড়া তোমাদের ঘর মনে কর কি চিরদিন খাড়া রহিবে?''

আর চুপ করে থাকে ব্রিটিশ? নবযুগের জমা টাকা বাজেয়াপ্ত করে নবযুগের প্রকাশ বন্ধ করে দিল তারা। তাতে কি হয়েছে। থেমে যাবার পাত্র নজরুল বা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ—কেউই নন। আইন অনুযায়ী এবার দু'হাজার টাকা জমা দিয়ে 'নবযুগ' নতুন করে বার করা হোল কিন্তু পরিচালক মণ্ডলীতে কেমন যেন একটা গড়িমসি ভাব দেখা দিল। নজরুলকেও তাঁর বেশ কিছু বন্ধু বোঝাল একজন জাতকবির পক্ষে একটা নিদিষ্ট পত্রিকায় পড়ে থাকা উচিত নয়।

একদিকে পরিচালক মণ্ডলীর গড়িমসি, অন্যদিকে বন্ধুদের কথাবার্তা —নজরুল নবযুগ ছাড়লেন, তার কিছুদিন পরে ১৯২১ সালের জানুয়ারীতে মুজফ্ফর আহ্মদও সরে গেলেন নবযুগ থেকে। নবযুগ বন্ধ হয়ে গেল। আর নজরুল তখন দেওঘরে চলে গেলেন বেড়াতে, আসলে নবযুগকে কেন্দ্র করে যে তর্ক বিতর্কের ঝড় উঠেছিল তাকে বিরক্ত হয়ে সরে গেলেন তিনি।

কিন্তু নজরুল যা ভেবেছিলেন তা হোলো না। দেওঘরে থেকে অনেক গান, কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তিন-চারটি গান আর মামুলী দু'একটি কবিতা ছাড়া লেখা হোলো না কিছুই, মাঝখান থেকে দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়লেন, শেষ উদ্ধার করতে হোল মুজফ্ফর আহ্মদকে। তিনি দেওঘরের সব দেনা মিটিয়ে নজরুলকে নিয়ে চলে এলেন তাঁর নতুন বাসায় ১৪।২ চেতলা হাটে। নবযুগ প্রতিষ্ঠার সময় ৩২নং কলেজ স্ট্রীট ছেড়ে মুজফ্ফর এসেছিলেন ৮।এ টার্ণার স্ট্রীটের এক বাসায়। সেখানে নিয়মিত আড্ডায় আসতেন বহু কবি সাহিত্যিক, নজরুলের বহু বিখ্যাত কবিতার জন্মও হয়েছে সেই বাসায়।

এই দেওঘর যাওয়া নিয়ে আর আফ্জালুল হক সাহেবকে কেন্দ্র করে এক এক গবেষক এক এক রকম কথা লিখেছেন। মূল কথা হোল, যেভাবেই হোক নজরুল ইসলাম যে প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে দেওঘর গিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নি। তা যদি হোত, তাহ'লে দেনার দায়ে দেওঘরে তিনি বিব্রত হতেন না, মুজফ্ফর আহ্মদকে পরিত্রাতা হিসেবে ছুটে যেতে হোত না।

ঠিক এই মুহূর্তে অনিমেষ, তোমাকে নিয়ে যাবো নজরুল জীবনের এক করুণ অধ্যায়ে। নজরুলের উদারতা, প্রাণপ্রাচুর্য্য, শিশুর মত সারল্য আর অপরিসীম দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এক সভ্যতার মুখোস পরিহিত বন্ধুবেশী শয়তান কি ভাবে নজরুলকে প্রবঞ্চিত করেছে সে কথা তোমার জানা দরকার। কবিরা সহজেই দ্রবীভূত হন, মিষ্টি কথা ও হাসিতে বিগলিত হন কিন্তু আড়ালে যে কত বিষ লুকোনো থাকে তার খবর নেবার জন্য ব্যস্ত হ'ন না কখনো—দেশনন্দিত বরেণ্য কবি

নজরুল ইসলামকেও এই প্রতারণার শিকার হতে হয়েছিল। আলী আকবর খান নামে এক সুবিধাবাদী বন্ধু জুটেছিলেন নজরুলের ভাগ্যে। সুযোগ সন্ধানী এই ব্যক্তিটি তখন নজরুলকে কেন্দ্র করে একই সঙ্গে দু'টি স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছেন, তার মধ্যে প্রথমটি হোলো তাঁরই অনুরক্তা ভাগ্নীকে কোনোরকমে নজরুলের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করিয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া আর দ্বিতীয় স্বপ্নটি হোলো নজরুলকে ঘরজামাই করে রেখে তাঁর যাবতীয় লেখা গল্প, কবিতা, গানের বই-এর প্রকাশক হয়ে বিত্তশালী হয়ে ওঠা। আর অনিমেষ, তুমি তো জানো খলের কখনো ছলের অভাব হয় না, অতএব আলী আকবর তাঁর নাটকে বুদ্ধির খেলা শুরু করে দিলেন, হাটে মাঠে, পথে প্রান্তরে নজরুল প্রসঙ্গে গদগদ হয়ে উঠলেন, তাঁর প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে কবিকে দিয়ে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'লিচুচোর' লিখিয়ে নিলেন আর শেষ পর্য্যন্ত ১৯২১ এর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ নজরুলের বন্ধুবান্ধব, মুজফ্ফর আহ্মদ ইত্যাদি কাউকে বুঝতে না দিয়ে নজরুলকে কায়দা করে নিয়ে গেলেন কুমিল্লায়, দৌলতপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে।

মহাকালের অমোঘ নির্দেশ কেউ খণ্ডাতে পারে না অনিমেষ, তুমি, আমি, রাম, রহিম—কেউ না। তা না হলে দৌলতপুর যাবার পথে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসাতেই বা উঠবেন কেন আলী আকবর খান, তাও আবার নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে? ইন্দ্রকুমারের একমাত্র ছেলে বীরেন্দ্রকুমার আর আলী আকবর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। বীরেন্দ্রকুমারের মা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী ছিলেন সাক্ষাত দেবীপ্রতিমার মত, স্নেহে বিগলিতা এক জননী, ছেলের বন্ধুদের সকলকেই তিনি দেখতেন সন্তানের চেয়েও বেশী, স্নেহ মমতা উজার করে দিতেন সকলের জন্যে। সংসারের আর্থিক অনটন ছিল ঠিকই কিন্তু সাহিত্য সংগীত সংস্কৃতি চর্চায় এই পরিবারটি তখন কুমিল্লায় সকলের কাছেই বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিল। নজরুল ঐ বাড়ীতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই বিরজাসুন্দরীকে 'মা' বলে ডাকলেন, আপন হয়ে উঠলেন অল্প সময়ের মধ্যে, গানে, কবিতায়, আবৃত্তিতে, নাচে বাড়ী গমগম করতে

লাগল। পাড়ায় সাড়া পড়ে গেল, শহরেরা যুবকেরা ভীড় করে এসে নজরুলের সঙ্গে আলাপ করলেন, আনন্দে অধীর হোলেন, নজরুল সকলের চোখের মণি হয়ে উঠলেন। আর চার পাঁচদিন ধরে নজরুল যতক্ষণ ঐ বাড়ীতে ছিলেন, সর্বদা তাঁর যিনি খোঁজখবর নিতেন, মুখের সামনে আহার্য্য এগিয়ে দিতেন পরম স্নেহে, তিনি আরেক মহিয়সী রমণী, শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী, বাড়ীর বিধবা জ্যেঠি-মা, প্রমীলার মা। তখন কেউ জানতো না এই প্রমীলাই একদিন নজরুল-ঘরণী হবেন, ভালবাসার বীজ তখনো কারো মনেই অঙ্কুরিত হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। প্রমীলার বয়স তখন তের। ডাকনাম দুলি, দোলন, আবার কেউ বা ডাকত দুলু বলে। রাজনৈতিক চেতনার ঢেউ এ বাড়ীতেও এসে পৌঁছেছিল, প্রমীলা, বীরেন্দ্রকুমারের বোন কমলা, অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে স্কুল ছেড়েছিল।

দিন পাঁচেক পর নজরুলকে নিয়ে আলী আকবর পৌঁছে গেলেন দৌলতপুরে আর পৌঁছেই ভাগ্নীকে ঠেলে দিলেন নজরুলের কাছে—মামার কথামত সৈয়দা খাতুন নাম্নী সেই ভাগ্নী নজরুলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশতে সুরু করলো আর নজরুলের রূপে, গুণে, তাঁর বাঁশী বাজানো শুনে, উদাত্ত গলায় গান আর আবৃত্তি শুনে সত্যি সত্যিই ভালবেসে ফেললো তাঁকে। নজরুল আদর করে তার নাম রাখলেন নার্গিস। পারসী ভাষায় নার্গিস মানে হোল শ্বেতশুভ্র সুগন্ধি ফুল। কিন্তু উভয়ের এই ভালবাসাকে সামনে রেখে কুচক্রী আলীর মাথায় অনেক পরিকল্পনা নেচে বেড়াতে লাগলো। ভাগ্নীকে আধুনিকা করে গড়ে তোলার নামে ভাগ্নীকে নিয়ে নির্জন ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে লাগলেন, অন্যদিকে গৃহবন্দী করলেন নজরুলকে, জোর করেই এই বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন তিনি—আর ভাবে ভোলা নজরুল যখন সব কিছু উপলব্ধি করলেন, তখন উপায় নেই, বিয়েতে মত দিলেন।

জানো অনিমেষ, নজরুলের এই মত দেওয়াকে কেন্দ্র করে কোনও কোনও তথাকথিত নজরুল জীবনীকার কিম্বা গবেষক লিখেছেন শেষ

পর্য্যন্ত খুব ধূমধাম করে এই বিয়ে হয়েছিল যদিও পরে নজরুল নার্গিসকে পরিত্যাগ করেছিলেন। এই সব গবেষকরা মনে মনে আলী আকবরের চাতুর্য্য আর নষ্টামি সমর্থন করেই একথা লিখেছেন এমন কথা ভেবে নেওয়ার সংগত কারণ আছে। আসলে এ বিয়ে হয় নি, মুসলিম বিবাহের যে নিয়ম তাও মানা হয় নি আর বিরক্ত নজরুল অপমানজনক সর্ত মানতে না পেরে বিয়ের মজলিস থেকে উঠে পড়েছিলেন। মুজফ্ফর আহ্মদ বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন এ বিয়ে হয় নি, বরং গৃহবন্দী নজরুল শেষ পর্য্যন্ত ভালবাসায় ধিক্কার দিয়ে রাত্রের অন্ধকারে দৌলতপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে বিয়ে মুসলিম আইন অনুযায়ী হোল না, কাবিননামায় স্বাক্ষর হোল না, সেটা নাটক হতে পারে—বিয়ে নয়।

এই বিয়েতে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন কুমিল্লার সেই বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবার। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভালো এক কাব্যসুষমায় ভরপুর নিমন্ত্রণ চিঠি সর্বত্র পাঠিয়েছিলেন আলী আকবর। সৌভাগ্য-ক্রমে বিয়ের চিঠি পেয়ে শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবী, শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী, প্রমীলা সেনগুপ্তা প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন বিবাহবাসরে আর তাঁরা গিয়েছিলেন বলেই আক্রমণ থেকে নজরুল বেঁচে গিয়েছিলেন, না হলে হয়তো মারদাঙ্গা করেও আলী আকবর এই বিয়ে দিতেন।

নজরুল বিয়ের আসর থেকে চলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কান্দিরপাড়ে, কুমিল্লায়, সেনগুপ্তবাড়ীতে। মমতাময়ী বিরজাসুন্দরী আর গিরিবালার স্নেহস্পর্শে তাঁর মনের যন্ত্রণা তখন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। আশ্চর্য্যের কথা, এই সময় নজরুল অনেকগুলি গান আর কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু তার একটাতেও হতাশা ছিল না, ছিল নূতন জীবনের গান, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা, ছিল যৌবনের তেজী ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে মুজফ্ফর আহ্মদ নজরুলের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং সেনগুপ্তবাড়ীতে দু'দিন আনন্দে কাটিয়ে ৮ই জুলাই ১৯২১ নজরুলকে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়।

বেদনাহত এই চিরতরুণ কবিকে সেনগুপ্তবাড়ীর সব্বাই খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন, কিশোরী প্রমীলার মনেও হয়তো মৃদুমন্দ প্রিয় বাতাস বইতে সুরু করেছিল, অশ্রুসজল চোখে তাঁদের বিদায় জানালেন সবাই, নজরুল চলে যাচ্ছেন শুনে ভীড় করে কুমিল্লার অধিবাসীরা তাঁকে বিষণ্ণমনে বিদায় জানালেন।

আশাহত আলী আকবর এরপরেও নির্লজ্জের মত কলকাতায় এসে নজরুলকে টাকার বাণ্ডিল দেখিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন. নজরুল তীব্র ঘৃণায় তাঁর সঙ্গে কথাও বলেন নি। আলী সঙ্গে এনেছিলেন একটি জাল চিঠি, যাতে নজরুলের লেখা এই চিঠিতে তিনি ঘটনার জন্য লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী বলে সাধারণের ধারণা হতে পারে। নজরুলকে যাঁরা গভীরভাবে চিনতেন তাঁরা বুঝলেন এ আর এক ধরণের নোংরা চালাকি, আর পরবর্তী কালে মুজফ্ফর আহ্মদ তো প্রমাণ করে দিয়েছেন এ চিঠি জাল, নজরুলকে ছোট করার এক হীন অপচেষ্টা।

এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা উচিত ছিল, কিন্তু নাগিসের কি হোলো একথা তুমি শুনতে চেয়েছ অনিমেষ—তাই অন্ততঃ দু'চার কথা বলা দরকার নিশ্চয়ই। নাগিস মামার ছলনায় পা রেখে ভালবাসা ভুলেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে নজরুলের দেশ জোড়া খ্যাতির সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে রাখার স্বপ্ন আবারো দেখতে সুরু করেছিলেন। তাই নজরুলের কাছে নম্র একটি পত্রাঘাত করেছিলেন নাগিস আর শৈলজানন্দকে সেই চিঠি দেখিয়ে নজরুল লিখেছিলেন একটি গান। তুমি বহুবার সে গান শুনেছ, তবু আরেকবার তার কথাগুলি তোমাকে কিছুটা মনে পড়িয়ে দিই—

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তারে।
ভুলে যাও তারে ভুলে যাও একেবারে॥
আমি গান গাহি আপনার দুখে
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে
আলেয়ার মত ডাকিও না আর নিশীথ অন্ধকারে।

নার্গিসের দেওয়া পত্রের উত্তরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নজরুল যা বলেছিলেন, তা হোলো, '···তুমি এই আগুনের পরশ মাণিক না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না। আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।·· তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবীও নেই।···তুমি রূপবতী, বিত্তশালিনী, গুণবতী—কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ংবরা হও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি কোন্ অধিকারে তোমাকে বারণ করবো বা আদেশ দেবো? নিষ্ঠুর নিয়তি সমস্ত অধিকার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।···আজিকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ; তাই তাকে পেতে চাই নে।···তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক।'

নার্গিস বুঝেছিলেন, আর নয়, নজরুলকে ফিরে পাওয়া আর সম্ভব নয়। মধ্যবয়সে তাই বিয়ে করেছিলেন এক অখ্যাত কবিকে আর আজ তাঁরা উভয়েই হারিয়ে গিয়েছেন। যে নজরুলকে ছোট করতে চেয়েছিলেন মামা-ভাগ্নী একযোগে, সেই নজরুল সকল তুচ্ছতার উর্ধে চিরশাশ্বত, মৃত্যুঞ্জয়ী, লক্ষ মানুষের ভালবাসার প্রদীপ হয়ে জ্বলছেন এপার বাংলা ওপার বাংলায়, সারা বিশ্ব চরাচরে।

ঠিক এই সময় সারা দেশে যে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল তারই উদ্দেশ্যে নজরুল ইসলাম গান লিখলেন গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে—

এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলো রে করতে ছেদন
শিকল দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি শঙ্খ কে বাজায়॥

মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন 'গান্ধিজীকে লক্ষ্য করে এটাই ছিল নজরুলের লেখা প্রথম গান। খানিকটা গান্ধীবাদও এই গানের ভিতরে আছে।' পরবর্তীকালেও নজরুল গান্ধিজীকে নিয়ে আরো কবিতা লিখেছেন। হয়তো তুমি ভাবছো অনিমেষ, তাহলে কি নজরুল

গান্ধিবাদী হয়ে উঠছিলেন ক্রমশ: ? রাজনৈতিক নেতারা কি বলবেন জানি না, কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করবে অন্যকথা। নজরুল বেশ কিছুকাল কংগ্রেস করেও গান্ধিবাদী হতে পারেন নি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এইভাবে স্বাধীনতা আসে না। আসলে গান্ধীবাদ বা মাকর্সবাদ কিংবা লেলিনবাদ—এর কোনটাই নজরুলকে প্রভাবিত করতে পারে নি। নজরুল জীবনের পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ অনিমেষ, তিনি বিশেষ কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের আজ্ঞাবহ প্রচারক ছিলেন না। আমি জানি, এই মুহূর্তে তোমার প্রশ্ন ঃ তাহলে কি ছিলেন তিনি? রাগ কোরো না অনিমেষ, এ প্রশ্ন মূর্খরাই করতে পারে, তোমার করা চলে না। নজরুল ছিলেন নিজেই এক জ্বলন্ত সূর্য,—অনাচার, অত্যাচার, অপশাসন, ব্যভিচার, সাম্প্রদায়িক কলুষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রবক্তা, শোষিত মানুষের স্বপক্ষে এক নিরলস কবি। ইংরেজের কঠোর শাসন তাঁকে থামাতে পারে নি, নিন্দুকের নিন্দা, স্বার্থান্বেষীর লোভ তাঁকে নেভাতে পারে নি, অভাবের রক্তক্ষয়ী দিবারাত্রির সংগ্রাম তাঁকে হারিয়ে যেতে দেয় নি। বলতে পারো তিনি নিজেই ছিলেন এক উজ্জ্বল চেতনা, যাঁকে সামনে রেখে দেশের কোটি কোটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আগামী দিনের গান শোনানো যায়, যাঁর কবিতায়, গানে চিরনূতনের স্পর্শ পাওয়া যায়।

এখন এসব কথা থাক অনিমেষ। আমরা দেখেছি প্রেমের ব্যর্থতা, আলী আকবরের হীনতা নজরুলকে নিঃশেষ করতে পারে নি, বরং নজরুল আরো বেশী উজ্জ্বল হয়েছেন। আরো বেশী কবিতা ও গান উপহার দিয়েছেন জাতিকে। আর এরই মধ্যে একদিন, মুজফ্ফর আহ্মদ যখন দেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সেই রকম এক সময়ে ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়ীতে নজরুল কাটালেন এক উত্তেজিত চিন্তাজড়িত বিনিদ্র রজনী। বাইরে তখন বৃষ্টির অকালপতনের শব্দ, চারিদিকে নিরালা নিঝুম অন্ধকার, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সেই শীত শীত বৃষ্টি ভেজা

রাত্রে নজরুল নীরবে জ্বেলে দিলেন আগুনের লেলিহান শিখা, কবিতায় বিপ্লব ঘটে গেল সেই বিস্ময়কর রাতে, জন্ম নিল 'বিদ্রোহী' কবিতা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহী'র প্রথম শ্রোতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন, 'বিদ্রোহী কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা। ...নজরুল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাকেই প্রথম পড়ে শোনালো।' আরও লিখেছেন '...নজরুলের কিম্বা আমার ফাউণ্টেন পেন ছিল না। দোয়াতে বারে বারে কলম ডোবাতে গিয়ে—তার মাথার সঙ্গে তার হাত তাল রাখতে পারবে না, এই ভেবেই সম্ভবতঃ সে কবিতাটি প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিল।' সকাল হতে না হতেই মোসলেম ভারতের সম্পাদক আফ্‌জাফুল হক এলেন অভ্যাসমত, শুনলেন সেই দীর্ঘ কবিতাটি আর বললেন, 'এখনই কপি করে দিন কবিতাটি, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।' নজরুল কপি করে দিলেন। হকসাহেব চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই এসেছিলেন 'বিজলী' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরবর্তীকালের প্রখ্যাত বিপ্লবী, তিনিও কবিতাটির কপি নিয়ে যান এবং তারপরেই মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হবার আগেই 'বিজলী'তে নজরুলের এই বিশ্বখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশ করে দেন।

তুমি সেই ঐতিহাসিক তারিখটি জানো অনিমেষ? একটিমাত্র দীর্ঘ কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়ে যাবার সেই তারিখটি হোলো ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারী, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ। ইতিমধ্যেই নজরুলের অনেকগুলি গান, গল্প, কবিতা জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু এই একটি কবিতা সেই প্রবহমানতার বাঁধ ভেঙ্গে, সময়ের ধীরগতির পরোয়া না রেখে, নিদ্রিত চেতনাকে ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জাতির সামনে এক নতুন ইতিহাস রচনা করে দিল, নজরুলকে 'বিদ্রোহী কবি' বলে নতুন সম্মানে সম্মানিত করলো। শুক্রবারের সেই বিশেষ সংখ্যা 'বিজলী' ছ'দিনেই শেষ হয়ে গেল—আবার নতুন করে সেই সংখ্যাটির পুনর্মুদ্রণ করেও জনগণের চাহিদা মেটানো ঠিকমত সম্ভব হোলো না। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখছেন, 'সেই সপ্তাহের বিজলী ছ'বারে উনত্রিশ

হাজার ছাপা হয়েছিল, ধরতে পারা যায় প্রায় দেড় দু'লক্ষ লোক কবিতাটি পড়েছিলেন। তার ফলে নজরুলের কবিখ্যাতি খুব বেশীরকম বেড়ে গেল।' কবিবন্ধু নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন, 'বিজলীতে বিদ্রোহী বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের যুবসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠল, যেন সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠল তাদের মধ্যে। উদীয়মান কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেন মধ্যগগনে প্রভাস্বর হয়ে দেখা দিল।' অভিনন্দন, আরো অভিনন্দন, আরো···, সারা দেশ জুড়ে যেন জেগে উঠলো ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণের দল, মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে, গ্রামে শহরে ঘরে ঘরে উচ্চারিত হতে লাগল বেঁচে ওঠার মহামন্ত্র—

বল বীর
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।

কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুক্তি পাগলের দল গর্জন করে উঠলো—

আমি বসুধা বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি পাথার কলরোল কল কোলাহল
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি ভূমিকম্প।

শোষিত, উৎপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে কবির সঙ্গে সমগ্র জাতি বলে উঠেছিল সেদিন—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে
ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

১৯৮৮ সালের এই মে মাসে কবির ৮৯তম জন্মদিনে, আজ থেকে ৬৬ বছর আগের লেখা ঐ কবিতাটি পড়ে রক্ত গরম হয়ে উঠবে অনিমেষ। সমাজ থেকে এখনও যে অত্যাচার শেষ হয় নি, যে উৎপীড়ন নিঃশেষিত হয় নি, শোষণ চলছে চতুর্দিকে, তার বিরুদ্ধে এই একটিমাত্র

কবিতাই আমাদের নেতৃত্ব দিতে পারে, গণমুখী আন্দোলনের মহান পতাকার রূপ দিতে পারে, এই একটিমাত্র কবিতাই এনে দিতে পারে আগামীদিনের রক্তিম সূর্যোদয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, '…কবিতার জ্বলন্ত দীপ্তি এমন তীব্র যে ছাপার অক্ষরেই আগুন ধরিয়ে দেবে।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, কবিতার চিন্তাধারা 'শুধু ছড়িয়ে পড়ল না, জীবনদায়িনী চেতনায় সকলকে বিদ্যুদ্দাম করে তুলল। …এই কবিতা লিখেই নজরুল জনমানসের নির্মল অন্তরঙ্গতায় উপনীত হোল।' পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন, "তরুণসমাজ তো বিদ্রোহীর ভাষায় বাক্যালাপ শুরু করে দিল। সকলের মধ্যে সেই মনোভাব— 'আপনারে ছাড়া কাহারে করিনা কুর্নিস'।" বুদ্ধদেব বসু লিখলেন; 'অসহযোগ অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন প্রাণ যা কামনা করেছিল, এ যেন তা-ই ; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।'

আর মানমর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা হারাবার ভয়ে ক্ষেপে গেলেন মোহিতলাল মজুমদার, শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস প্রমুখ কয়েকজন। তাঁরা নানান ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে নজরুলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে সুরু করলেন। ফল হোল উল্টো, কালের অতলে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত তাঁদের নাম আর অপরদিকে যুগ যুগ ধরে উচ্চারিত নজরুল ইসলাম অমর হয়ে থাকলেন। সব থেকে মজা একদা যে মোহিতলাল নজরুলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন আর পরে নিন্দা করতে করতে তাঁরই অজ্ঞাতসারে নজরুলে কাব্যছন্দানুসারী হয়ে পড়েছিলেন। সজনীকান্ত পরে নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে একে অপরের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েও ছিলেন।

এই সময়েই নজরুলের সঙ্গে আর একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় ঘটলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীর অনুরোধমত 'বাংলার কথা' পত্রিকার জন্যে নজরুল লিখলেন তাঁর সেই বুক কাঁপানো ঐতিহাসিক গান—

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল, কর রে লোপাট

রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী !
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'।

১৯২২ সালের ২০শে জানুয়ারী এই গানটি 'বাংলার কথা'য় ছাপা হোলো—আবার আলোড়ন চতুর্দিকে। বাসন্তী দেবী নজরুলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। কেউ কেউ বলেন এই গানটি নজরুল হুগলী জেলে বন্দী থাকাকালীন লিখেছিলেন—এটা ভুল তথ্য। এই প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদের একটা কথা আমার বার বার মনে পড়ে যায়। তা হোলো, 'কাজী নজরুল ইসলামের জীবনচরিত রচনা করতে গিয়ে সে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটিই তাকে আঁকতে হবে। নিজের মনের রঙ দিয়ে নজরুলের কোন চরিতকার যদি তার চিত্র আঁকতে চান, তবে তিনি নিশ্চয় ভুল চিত্র আঁকবেন।' যেমন নজরুল রুশবিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এই বাস্তব সত্যকে অনেকে অস্বীকার করেছেন, নজরুলের জীবন নিয়ে অনেকে বানানো গল্প ছেড়েছেন কিন্তু আবারো সেক্ষেত্রে মুজফ্ফর আহ্মদ বলেছেন, 'যাঁরা নজরুলের সম্বন্ধে চটকদার কথা বলেন ও লেখেন, তাঁদের আমি একান্তভাবে অনুরোধ করবো যে তাঁরা তাঁদের স্মৃতির সঙ্গে গভীরভাবে বোঝাপড়া করে কথাগুলি বলবেন।'

নজরুল আর একজন কবিকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, তিনি ছন্দ-যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁকে উদ্দেশ্য করে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন তিনি। ১৯২২ সালের ২৪শে জুন, সত্যেন্দ্রনাথ প্রয়াত হলে 'দৈনিক সেবকে' এক মর্মস্পর্শী সম্পাদকীয় লিখেছিলেন নজরুল, স্মরণসভায় গেয়েছিলেন স্বরচিত গান—

চল চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে।

দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥···

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণের কয়েক মাস আগের কথায় ফিরে যাই। তালতলা লেনের বাড়ীতে থাকতে থাকতে নজরুলের মন ব্যাকুল হতে লাগলো ফেলে আসা এক স্নেহ-সুশীতল ছায়ার জন্য, শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে কুমিল্লা চলে গেলেন ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে—প্রায় সাড়ে তিন মাস একটানা কাটিয়ে দিলেন কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারে আর দোলন অর্থাৎ প্রমীলার সঙ্গে তাঁর মনের পরিচয় ঘটে গেল নিবিড়ভাবে। তাঁর মতো এক অবারিত বাধাবন্ধহীন দুর্দম কবি ধরা পড়ে গেলেন এক শান্ত স্নিগ্ধ দাবীহীন নম্র কিশোরীর প্রীতির শাসনে, তেইশ আর চোদ্দ বছর বয়সের দু'টি জীবন শাশ্বতকালের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার ভাবনায় ভাবিত হোল, নজরুল লিখলেন একটি হৃদয়মথিত করা গান—

হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমরজয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা হার পরাই তোমার কেশে॥

আর একই সময়ে 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য পাঠালেন তাঁর অপর একটি বিখ্যাত কবিতা 'প্রলয়োল্লাস।' মনে পড়ছে অনিমেষ, সেই রক্ত গরম করা কয়েকটি ছত্র—

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কাল বোশেখীর ঝড়।

আর গানটি ছাপা হোল মোসলেম ভারতে। বন্ধুরা বুঝলেন, এবার

নজরুল হৃদয় হারিয়েছেন, দোলনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে আর কেউ আটকাতে পারবে না।

ইতিমধ্যে তাঁর ডাক এলো দৈনিক সেবক পত্রিকা থেকে। মুহম্মদ ওয়াজিদ আলির একান্ত আহ্বানে নজরুল চলে এলেন কলকাতায়, কথা দিয়ে এলেন প্রমীলাকে স্থায়ী জীবনসাথী করার, মাসিক একশো টাকা বেতনে যোগ দিলেন ঐ পত্রিকায়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে উত্তাপহীন এই পত্রিকায় তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন মনে মনে। এরই মধ্যে হাফিজ মস্‌উদ আহ্‌মদ নামে একজন সাহিত্যানুরাগী আড়াই শো টাকা সম্বল করে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কাছে এলেন একটি রাজনৈতিক চেতনার পত্রিকা করবেন বলে। এই কম টাকায় পত্রিকা করা সম্ভব নয় ভেবে মুজফ্‌ফর সাহেব প্রস্তাব নাকচ করলেন কিন্তু নজরুল বললেন, 'দেখি চেষ্টা করে। আমি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবো।'

তাই হোলো। ক্রাউন ফলিও সাইজে আট পৃষ্ঠার কাগজ, দ্বিসাপ্তাহিক কাগজের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হোলেন কাজী নজরুল ইস্‌লাম, মুদ্রাকর ও প্রকাশক আফ্‌জালুল হক, প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ মস্‌উদ আহ্‌মদ। নগদ প্রতি সংখ্যার দাম এক আনা, বার্ষিক পাঁচ টাকা। পত্রিকার নাম রাখা হোল 'ধূমকেতু।'

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'নজরুল তখন মূর্ত বিদ্রোহ, আচার অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভেঙ্গে নতুন চেতনায় মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাণী তার কণ্ঠে। গতানুগতিক ব্যবস্থায় যারা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে তাদের অকল্যাণ ঘোষণা করে তাই ধূমকেতুর উদয় হোল।'

বিপ্লবী বারীন ঘোষ অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন, 'আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' দেশের যাঁরা সাচ্চা সোনা, তাঁদের খাদ পুড়িয়ে উজ্জ্বল করে তুলুক, ···আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' জতুগৃহ জ্বালিয়ে দিক্, স্থির মণি হয়ে বঙ্গমাতার স্বর্ণ সিংহাসন সাজিয়ে দিক্।'

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বচনে বললেন: 'সৃষ্টি যারা করবার, তারা করবে। তুমি মহাকালের প্রলয় বিষাণ এবার বাজাও। অতীতকে আজ ডোবাও, ভয়কে আজ ভাঙ্গ, মৃত্যু আজ মরণের ভয়ে

কেঁপে উঠুক।' শরৎচন্দ্র তাঁর শুভেচ্ছা পাঠালেন, '…আশীর্বাদ করি, যেন শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সত্যকথা বলিতে পার।' আর কবিগুরু আশীর্বাণী পাঠালেন কবিতায়—

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন ঃ
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

কবিগুরুর এই আশীর্বাণীকে মাথায় বহন করেই 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হোল ১৯২২-এর ১২ই জুন, শিক্ষিত তরুণসমাজ হাতের সামনে নতুন এক অগ্নিচেতনাকে পেলেন, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ধূমকেতু জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। নজরুল লিখলেন—

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নজরুল লিখলেন—'দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকি—তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী।' লিখলেন, 'সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের স্বাধীনতা চায়। …ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পুর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। …পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে।'

'ধূমকেতু'র ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের অফিস সরগরম হয়ে উঠল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন তথা জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ভূপতি মজুমদার, বর্ধমানের বলাই দেবশর্মা, দ্বৈপায়ন ছদ্মনামের আড়ালে

মুজফ্ফর আহ্মদ, বীরেন সেনগুপ্ত, নলিনীকান্ত সরকার, শান্তিপদ সিংহ, দাদাঠাকুর এবং আরো অনেক বিখ্যাত মানুষ 'ধূমকেতু'র সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। দেখা করতে গেলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভেবেছিলেন অগ্নিতাপস নজরুল হয়তো চোখ লাল করে বসে থাকবেন, কিন্তু আলাপ করে ধন্য হয়ে লিখলেন, 'পরনে রঙ্গিন লুঙ্গি, গায়ে টান টান ফর্সা গেঞ্জি, তক্তপোশের উপর বসে আছেন নজরুল। আগুন কোথায়, দুই পদ্মপলাশ চোখে বিশাল ও অগাধের স্বপ্ন। সমস্ত উপস্থিতিই একটি প্রীতিময় অভ্যর্থনা দিয়ে ভরা।'

মুজফ্ফর আহ্মদ লিখছেন, 'অনেক শক্ত বুকের পাটা ছিল বলেই নজরুল এইভাবে খোলাখুলি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলতে পেরেছিল। ...ধূমকেতুর ওপরে পুলিসের খুব কড়া নজর থাকাই স্বাভাবিক ছিল এবং সে নজর ছিলও।' ইতিমধ্যে শারদীয় সংখ্যায় ২৬শে সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু'তে নজরুল লিখলেন তাঁর জ্বালাময়ী অগ্নিঝরা কবিতা—'আনন্দময়ীর আগমনে'। লিখলেন—

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে—অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা—আসবি কখন সর্বনাশী?

পুলিস আর গোয়েন্দাবিভাগ তৎপর হোল। আঠাত্তর লাইনের এই কবিতা পড়ে তাদের মাথা গরম হয়ে গেল। নজরুলকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সে তখন বালিতে দু'দিন আত্মগোপন করে চলে গিয়েছে কুমিল্লায়। কিন্তু দিনকয়েক পরেই ১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর পুলিস তাকে রাজদ্রোহের অপরাধে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো কলকাতায়। সেই পরাধীন ভারতবর্ষে বিচারের নামে কি প্রহসন চলতো তা তো তুমি জানো অনিমেষ—নজরুলও রেহাই পেলেন না, বিচারের নাটক চললো কিছুদিন ধরে—পরে ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী ১২৪এ ধারায় নজরুলকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো। এর আগে ৮ই জানুয়ারী

নজরুল আদালতে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই বিবৃতি একটি মূল্যবান সম্পদ। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে এই বিখ্যাত বিবৃতিটির কয়েকটি ছত্র তোমাকে মুগ্ধ করবে অনিমেষ—

'আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। ...একধারে রাজার মুকুট, আর একধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর একজন সত্য—হাতে ন্যায়দণ্ড। ...রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ, অর্থ। আমার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ। ...আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। ...সে বাণী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ।'

কবি বন্দী হোলেন। ভারতের স্বাধীনতার দাবীদার, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি অনিমেষ, যিনি জীবনমরণ তুচ্ছ করে, প্রতিষ্ঠা যশ উপেক্ষা করে উন্নতশির রাজবন্দী হলেন সেদিন। জেলে গিয়েই সুরু করলেন আলাপ পরিচয়, আনন্দোল্লাস, গলা ফাটানো গান আর উল্লেখযোগ্য রাজবন্দী যাঁরা ছিলেন, যেমন বিপ্লবী নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, মুজিবর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, আক্রাম খাঁ, বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা, সতীন্দ্র সেন, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠলো। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দী নজরুল কখনই নিজেকে বন্দী মনে করতেন না, বরং মনে করতেন অবহেলিত রাজবন্দীদের স্বপক্ষে লড়াই করার জন্যেই তিনি জেলে এসেছেন।

এই সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করলেন। নজরুল এই সম্মানে আনন্দ পেলেন খুব আর রবীন্দ্রনাথ একজন বরেণ্য কবিকে তাঁর এই বইটি উৎসর্গ করে যথার্থ ভালবাসার পরিচয় দিলেন সেদিন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'কবিগুরু তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা নজরুলকে উৎসর্গ

করলে জেলে ওর কাছে পৌঁছে দেবার ভার আমার উপর পড়ল। একজন সাধারণ 'কনভিক্ট'কে গ্রেট পোয়েট 'টেগোর' বই 'ডেডিকেট' করেছেন একথা শুনে তাজ্জব বনে গেল জেলর সাহেব···সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলো: ঈজ হি রীয়েলী সো গ্রেট ম্যান? থ্যাঙ্ক হেভেন্স।' আলিপুর জেলে নজরুলের মর্য্যাদা বেড়ে গেল ঠিকই আর তক্ষুণি গোপন পরামর্শ বসলো শাসকশ্রেণীর কক্ষে: আর নয়, নজরুলকে অন্যত্র সরাও, আরো কঠোর হও।

১৪ই এপ্রিল নজরুলকে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করা হোল। কোমরে দড়ি বেঁধে সাধারণ কয়েদীর পর্য্যায়ে নামিয়ে এনে নজরুলকে হুগলী জেলে পরিয়ে দেওয়া হোল খাটো কুর্তা, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি জেলের পোষাক আর নিকৃষ্টমানের খাবার দেওয়া সুরু হয়ে গেল সেইদিন থেকেই। নজরুল ইসলাম এই অবর্ণনীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন, জেল সুপারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের অনুকরণে লিখলেন তাঁর প্রখ্যাত প্যারডি—

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারই গান তোমারই ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয় ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।···

জেল সুপার এলেই নজরুল এই গান গাইতেন। সুপার রেগে লাল কিন্তু করবেন কি? নজরুল কোনও শাস্তিকেই ভয় করেন না, জেল সুপারের সব শয়তানীই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। অত্যাচার যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, নজরুল অনশন ঘোষণা করলেন। প্রথমে এই অনশনের সংবাদ জেল কর্তৃপক্ষ চেপে রেখেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা বাইরে প্রকাশ পেয়ে গেল। খবরের কাগজে শিরোনাম হোলেন

নজরুল, দেশে চাঞ্চল্য দেখা দিল, অনেকেই নজরুলকে অনশন প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলেন কিন্তু অনশন চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নজরুল কারো কথাই শুনলেন না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনশন ত্যাগ করার অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম করলেন, যার মর্মার্থ হোল, অনশন ত্যাগ করো, আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়। জেল কর্তৃপক্ষ সেই টেলিগ্রাম ফেরৎ পাঠিয়ে দিল 'নজরুল ইসলাম বলে কেউ নেই এই জেলে' একথা জানিয়ে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দিনগুলিতে ব্রিটিশ শাসকদলের জঘন্য অত্যাচারে কত যে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ হয়েছেন, কত শত তাজা তরুণ তরুণীর প্রাণদীপ নিভে গিয়েছে সে কথা তুমি তো জানো অনিমেষ—বিদ্রোহী কবির এই অনশনকে উপলক্ষ্য করেই শাসকদল তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল, একথা নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিতে হবে না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, এমন কি দাদা সাহেবজান, মা ও গ্রামের একজন প্রতিবেশী—সবাই ব্যর্থ হোলেন। অনড় অটল প্রতিজ্ঞায়, অত্যাচার বন্ধের দাবীতে নজরুল তাঁর অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন, শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, তবুও তিনি অবিচল তাঁর আদর্শে। দেশব্যাপী আন্দোলন স্থুরু হয়ে গেল, অনশনের আটত্রিশ দিন পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। কলকাতায় দেশবন্ধুর ডাকে এক বিরাট জনসভায় একের পর এক নেতা ধিক্কার জানালেন জেল কর্তৃপক্ষের নির্মমতার। এবারে টনক নড়লো শাসকদলের, তারা নজরুলকে আবার বিশেষ শ্রেণীর বন্দী হিসাবে ঘোষণা করলো।

কুমিল্লা থেকে এলেন বিরজাসুন্দরী দেবী। উনচল্লিশ দিনের মাথায় তিনি নজরুলের সঙ্গে দেখা করলেন। এবার আর অনুরোধ এবং জননীসমা বিরজাসুন্দরীর শাসন ঠেলতে পারলেন না নজরুল, তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন, দেখা করলেন উল্লসিত বন্ধুদের সঙ্গে।

আবার স্থান পরিবর্তন। নজরুলের সারা জীবনই তো এই স্থান পরিবর্তনের ইতিহাসে ভরা। এবার তাঁকে পাঠানো হোল বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী করে, বহরমপুর জেলে। জুন মাসের আঠারো তারিখে

নজরুল বহরমপুর জেলে এলেন। আবার গান, নাটিকা লেখার সুরু। জেলসুপার বসন্ত ভৌমিক একটা হারমোনিয়াম দিলেন নজরুলকে। গানে গানে জেলে নূতন জীবনের বন্যা বয়ে গেল। খুব আশ্চর্য্য হবার মতই কথা অনিমেষ, জেলে নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে দুর্গাপূজার আয়োজন হোল, হোল গান বাজনার আসর, নাটিকা। আর এই প্রসঙ্গে বহরমপুর জেলে নজরুলের সহবন্দী নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন—

"দুর্গাপূজা সমাগত। বাঙালী বন্দীর জীবনে এক করুণ বিষাদঘন মূর্তি। বন্দী ভাবে বাইরের পূজার কথা। কেউ বা নিজের গৃহের।… হলামই বা আমরা বন্দী। মুখ কালি করে বসে থাকতে হবে নাকি তাই বলে। মেতে উঠলাম সবাই। কাজী এলেন ফর্দ নিয়ে। অষ্টমী আর বিজয়ার সন্ধ্যায় জমে উৎসব। গানে অভিনয়ে আবৃত্তি দিয়ে ভরে দিতে হবে সবার মন। …কাজী লিখতে বসলেন ছোট একটি নাটিকা। পাত্র পাত্রীর ভিড় নেই। কাজী একাই একশো।…'

একদিন তাঁর বন্দী জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এলো, ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আবার তিনি মুক্তির আনন্দে নতুন করে দেখলেন তাঁর পরিচিত এলাকাকে, জড়িয়ে ধরলেন বন্ধুদের। মনভ্রমর কানে কানে শুনিয়ে গেল যে আছে অপেক্ষা করে সেই মানসপ্রিয়ার কথা, দিনকয়েক বহরমপুরে নলিনাথ স্যান্যালের বাড়ীতে থেকে নজরুল পা বাড়ালেন কুমিল্লার দিকে, প্রমীলার ভালবাসায় ডুবে যেতে, প্রেমের ঐশ্বর্য্যে নিজেকে ভরিয়ে নিতে।

তিন

অনিমেষ, তোমার হয় তো ঘুম এসেছে ছু'চোখে। সেদিন কিন্তু ঘুম ছিল না নজরুলের, তাঁর কথা ভেবে ঘুম ছিল না দেশবাসীর, ব্রিটিশ শোষকের চোখের ঘুম পালিয়ে গিয়েছিল তাঁর ভয়ে। ঠিকই বলেছ অনিমেষ, এই রহস্যরোমাঞ্চে ভরা ক্লান্তিহীন জীবনকাহিনী শুনতে শুনতে ঘুম আসে না, আসতে পারে না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় বলি—'কাজী নজরুল ইসলাম—এ নাম চিরকালের আশ্চর্য্য বিস্ময়কর নাম। ···কবি কাজী নজরুল ইসলাম কালবৈশাখীর ঝড়। শুধু সাহিত্য-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নয়, বাঙ্গালীর সমগ্র জীবন ক্ষেত্রে।' ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের মত নজরুলও বিশ্বাস করেছেন, মানুষের ঐতিহ্যে যা শাশ্বত, যা সনাতন যা শুভ, যা ধ্রুব তাকে স্বীকৃতিদান করতেই হবে, কিন্তু যা অকল্যাণকর, যা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত, যা মানবতা-বিরোধী তারই ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুনের হর্ম্য রচিত হবে।' তাই আবিলতার বিরুদ্ধে সোচ্চার, শোষণের বিরুদ্ধে রুদ্রতেজে বিদ্রোহী আর অপরদিকে সৃষ্টির আনন্দে পরমসুন্দর দিব্য-জ্যোতি নজরুলকে আমরা নির্ঘুম চোখে দেখেছি আর অবাক হয়েছি।

কারামুক্তির পর নজরুল আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ১৯২৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বৈকালিক সভায় নজরুলকে সংবর্ধনা দেওয়া হোল এক বিশাল সমাবেশে। প্রখ্যাত জীবনীকার নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-ও সংবর্ধিত হোলেন ঐ সভায়। নজরুলের দেশপ্রেম, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষণ দিলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং আরো অনেকে। নজরুল সেই সভায় তাঁর বিদ্রোহী কবিতাসহ আরো ছু'তিনটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন, নিজের

লেখা বেশ কয়েকটি গানও শোনালেন সকলকে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী মহিলা সমাজের পক্ষ থেকে নতুন করে সংবর্ধনা জানানো হোল কবিকে। সেখানেও নজরুল সকলকে মুগ্ধ করলেন গান গেয়ে, আবৃত্তি করে। একটি কিশোরী গভীর শ্রদ্ধায় নজরুলের গলায় তার সোনার হার পরিয়ে দিল কিন্তু পরবর্তীকালে নিষ্ঠুর সমাজের হৃদয়হীনতায় আত্মহত্যা করতে হয়েছিল তাকে। নজরুল যখন জানতে পেরেছিলেন, তখন তিনি গভীর শোকাহত হয়েছিলেন সেই কুড়িয়ে পাওয়া বোনের মর্মস্পর্শী পরিণতির কথা ভেবে।

ঐ দু'টি সংবর্ধনা সভাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেদিনীপুর কলেজ প্রাঙ্গণে। ২৪ তারিখ সন্ধ্যায় মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ হলে নজরুল আবারো অভিনন্দিত হোলেন নাগরিক সমাবেশে। শহরের বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব প্রভৃতিও নানা অভিনন্দন জানালো। ঈদগায় মৌলবীরা কোরাণ থেকে বিভিন্ন আয়েত পাঠ করে নজরুলকে অভিনন্দিত করলেন। পরবর্তীকালে নজরুল মেদিনীপুরবাসীকে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙ্গার গান' উৎসর্গ করেছিলেন।

এরও আগে নজরুল সংবর্ধিত হয়েছিলেন তাঁরই স্বক্ষেত্রে, রাণীগঞ্জে ১৯২২ সালে, তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটির জন্যে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে যে মানপত্র দেওয়া হয়েছিল, তার প্রথম কয়েকটি ছত্র তোমাকে শোনাই—

এস রৌদ্ররসের 'বিদ্রোহী' কবি ! অদ্রি অটল ধর্ম
এস তূর্ণ আবার পূর্ণ করিতে শূন্য জগৎ শর্ম !
আজি অদ্রোহময় ভদ্রের মত নিদ্রিত হ'ক জাগ্রত
আজি হউক দীপ্ত সুপ্ত জগতে লুপ্ত মহিমা অক্ষত।...

সম্ভবতঃ রাণীগঞ্জের এই সংবর্ধনা সভাই ছিল নজরুলের জীবনে প্রথম সংবর্ধনা সভা। পরবর্তীকালে সওগাত পত্রিকার উদ্যোগে কবি সংবর্ধনা, এলবার্ট হলে জাতীয় সংবর্ধনা ইত্যাদি অনেক অনেক সংবর্ধনা তিনি পেয়েছেন—তবু অনিমেষ, আমি বলবো, এর আগেও বলেছি—যা করা উচিত ছিল তাঁর জন্যে, তা করা হয় নি এবং কেন একথা বলছি, সে

কথাও যথাসময়ে শোনাবো তোমাকে।

এদিকে প্রমীলা-নজরুলের বিবাহবন্ধনের ব্যাপারটা যথেষ্ট এগিয়ে এসেছে সামনে। সব কিছু বুঝতে পেরে স্বয়ং গিরিবালা দেবী এই বিয়েতে তাঁর যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে সে যুগে এক নয়াবিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। কুমিল্লার সংসার ছেড়ে, প্রমীলা আর নজরুলের ভবিষ্যত চিন্তা করে তিনি কলকাতায় চলে এলেন মধ্য-এপ্রিলে। বাধা এলো চতুর্দিক থেকে কিন্তু গিরিবালা দেবী পর্বতকন্যার মতই অনড় থাকলেন তাঁর চিন্তাধারায় আর তাঁরই চেষ্টায় বিয়ের দিনও স্থির হোল ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল, ৬নং হাজী লেনের বাড়ীতে। উপস্থিত ছিলেন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, নুর লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মওলবী মইনুদ্দীন হোসায়ন সাহেব, কুমিল্লার আবদুস সালাম, মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং আরো অনেকে। মুজফ্ফর আহ্মদ প্রভৃতি বলেছেন এই বিয়েতে নজরুল চায় নি প্রমীলার ধর্মান্তর করা হোক এবং শেষ পর্যন্ত নজরুলের ইচ্ছাই পূর্ণ হোল। এই প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন, 'মুসলমান স্মৃতিশাস্ত্র থেকেই একটি বিধান পাওয়া গেল যে বর ও কনে যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়, তাহলে তারা নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এই বিধিমতে নির্বিঘ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হল নজরুল ও প্রমীলার। প্রমীলার ইসলাম ধর্মগ্রহণ করার প্রয়োজন হল না।'

মারহাব্বা নজরুল, মারহাব্বা। অভিনন্দন এলো চতুর্দিক থেকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরো অনেকে এই বিয়েকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু খেপে গেলেন রক্ষণশীল কিছু হিন্দু-মুসলমান, তাঁরা নজরুলকে নিন্দা করলেন তীব্র ভাবে, গিরিবালা দেবীও সেই নিন্দা থেকে বাদ গেলেন না। সর্বংসহা জননী সাক্ষাৎ ভগবতীর মত বুক দিয়ে আগলে রাখলেন নজরুল-প্রমীলাকে। ধীরে ধীরে বিরজাসুন্দরী দেবী এবং কুমিল্লার আত্মীয়স্বজনদের মন নরম হয়ে এলেও বাইরের সমাজ গরম হয়েই থাকলো, 'প্রবাসী' নজরুলের লেখা ছাপা বন্ধ করল। পরবর্তীকালে নজরুল তাঁর 'সর্বহারা' বইটি উৎসর্গ

করেছিলেন বিরজাসুন্দরী দেবীর নামে আর শ্রীমতী এম. রহমান, যিনি এই বিয়েতে অনেক সাহায্য করেছিলেন, তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিলেন 'বিষের বাঁশী' বইটি।

ভালবাসাকে নজরুল ঠিকই পেলেন, কিন্তু অনিমেষ, আমাদের অন্ধ গোঁড়ামি, হিন্দু পণ্ডিত আর মৌলভী মুসলমানের বাধার গতি অব্যাহত থাকল, নজরুল কলকাতার কোথাও ভাল বাসা জোগাড় করতে পারলেন না। এই দুঃসময়ে হুগলীর বিপ্লবী প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, হামিদুল হক প্রমুখেরা এগিয়ে এলেন, অনেক কষ্টে কংগ্রেস নেতা খগেন ঘোষের বাড়ীতে কিছুদিন সস্ত্রীক নজরুলকে রাখা হোল পরে হুগলীতেই মোগলপুরার গলিতে হামিদুল নবির বাড়ীতে চলে গেলেন নজরুল। সঙ্গে স্ত্রী প্রমীলা আর শাশুড়ী গিরিবালা দেবী। হুগলীতে নজরুল ১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এই বাড়ীতেই জন্ম নিল নজরুলের প্রথম পুত্র কৃষ্ণ মহম্মদ। এর আকিকা উৎসবে নজরুল অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ইত্যাদি অনেকেই সেদিন সারা-রাত ধরে গানবাজনার আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। আর এই সময়েই নজরুল আবার নতুন করে রাজনৈতিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। মুজফ্ফর আহ্মদ লিখছেন, 'তার গতিবিধি কেবল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সভা সমিতিতে আর সীমাবদ্ধ থাকলো না। ১৯২৬ সালে সে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিল। ···১৯২৪ সালে হুগলীতেই প্রথম গান্ধিজীর সঙ্গে নজরুলের মুখোমুখী পরিচয় হয়েছিল। তাঁর আগমন উপলক্ষে সে গান ও কবিতা রচনা করেছিল।' নজরুল তাঁর গান শোনালেন গান্ধিজীকে—

আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এল
কংস কারার দ্বার ঠেলে
আজ জাত বেজাতের বিভেদ ঘুচি
এক হোল ভাই বামুন মুচি।

শোনালেন আরও একটি বিখ্যাত গান—

ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চলার শব্দে তোর।

হুগলীতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন নজরুল, একরাশ গোলাপ ফুলের মত তাঁর সৌগন্ধ, মধ্যাহ্নের সূর্যতেজের মত তাঁর তেজদীপ্ত কণ্ঠস্বর, ভোরের পাখীর মত তাঁর মন আকুল করা গান আর ঝর্ণার উদ্দাম গতির মত অবারিত কবিতায় হুগলী তখন উদ্বেল। ঠিক সেই সময়েই, ১৯২৪এ আর একটি বড় রকমের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন নজরুল এবং তুমি হতবাক হয়ে যাবে অনিমেষ, তারকেশ্বরের দোর্দণ্ড প্রতাপ মোহান্তের বিরুদ্ধে ঐ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নজরুল শুধুমাত্র গান গেয়ে মোহান্তের সব লাঠিয়ালের মন জয় করে নিয়েছিলেন, সেদিন যেন এক ঐশীশক্তি তাঁর ওপর ভর করেছিল। মোহান্তের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আহুত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, আরো অনেকে এবং নজরুল ইসলাম নিজে। এই সভা পণ্ড করার জন্য উপস্থিত ছিল সহস্রাধিক লাঠিয়াল কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে নজরুল সেদিন গা শিউরে ওঠা যে গান গেয়েছিলেন আর যে গান শুনে লাঠিয়ালরা হাতের লাঠি ফেলে সত্যাগ্রহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ঐ অত্যাচারী মোহান্তর বিরুদ্ধেই গর্জন করে উঠেছিল, সে গানের এক নির্বাচিত অংশ তোমাকে শোনাতে চাই অনিমেষ—

জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী
ঐ ডুবালো পাপ চণ্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী
জাগো বঙ্গবাসী।

* * *

তোদের পূজার প্রসাদ বলে খাওয়ায় পাপ পুঁজ সে গুলে
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস পাপ ব্যভিচার রাশি রাশি।
জাগো বঙ্গবাসী।...

জানো অনিমেষ, হুগলীর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঐ জ্বালাময়ী গানে নতুন চেতনার জন্ম হয়েছিল তখন, পরবর্তীকালে বিচারে মোহান্ত গদী

থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। শান্তি এসেছিল চতুর্দিকে। চারণ কবি নজরুল উৎপীড়িত মানুষের কানে জেগে ওঠার যে গান শুনিয়েছিলেন সেদিন, হুগলী সে কথা এখনো ভোলে নি, ভুলবেও না কোনদিন।

এরই মধ্যে ঘটলো এক বেদনাদায়ক ঘটনা। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রথমপুত্র কৃষ্ণমহম্মদের অকাল মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়লেন কবি। আর নয়, কৃষ্ণস্মৃতি বিজড়িত ঐ বাড়ীতে আর নয়, ১৯২৫-এর জানুয়ারীতে মোগলপুরার বাড়ী ছেড়ে সপরিবারে নজরুল চলে গেলেন চকবাজারের 'রোজভিলা' বাড়ীর এক অংশে। বন্ধুবান্ধবের আসা যাওয়া, নানান সভাসমিতিতে যোগদান আর রাজনৈতিক হাওয়ায় নজরুল আস্তে আস্তে কৃষ্ণমহম্মদের শোক ভুললেন। মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, 'নজরুলের বহু বিখ্যাত গান ও কবিতার রচনাস্থল হুগলী। ...দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর বিষয়ে যে সকল গান ও কবিতা নজরুল লিখেছিল তার সব ক'টিরই রচনাস্থল হুগলী। তার সুবিখ্যাত 'ঝড়' কবিতাটিও হুগলীতেই রচিত হয়েছিল। আরও বহুসংখ্যক কবিতা হুগলীতে থাকার সময় সে রচনা করেছে।'

কেমন করে সংসার চলতো কবির? সকাল থেকে রাত অবধি অভ্যাগতদের ভীড়, চা-সরবৎ, পান আর খাওয়ার আয়োজন অথচ সংসারধর্মে উদাসীন বাউল কবির অবস্থা তখন বিপ্লবী প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'কোনদিন হাঁড়ি চড়ে, কোনদিন চড়ে না। অতিথি অভ্যাগত আছেই। একমাত্র লেখার দক্ষিণার উপর তাঁর সংসার চলছে। শত অভাবেও তাঁর প্রাণখোলা উদাত্ত হাসি, আবেগময় সুরোল্লাস, অগ্নিস্রাবী কবিতার স্রোত ব্যাহত হয় নি। ...হতভম্ব হয়ে যাই যে, কী করে কবি অভাবের তাড়নাতে জর্জরিত হয়েও শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গানগুলি লিখে চলেছিলেন।' আর এই অভাব জর্জরিত সংসারে প্রাণবান পুরুষসিংহ নজরুলকে দেখে কবি গোলাম মোস্তাফা লিখেছিলেন—

কাজী নজরুল ইসলাম
তার বাসাতে একদিন গিস্‌লাম।
ভায়া গান গায় দিনরাত
হেসে লাফ দেয় তিন হাত।...

এরই মধ্যে অভাবের যাবতীয় বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করে নজরুল তখন রাজনীতির আসরে নেমে পড়েছেন। বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নৈহাটি ভাটপাড়া যুব সংগঠনে বলিষ্ঠ সংগীতস্রষ্টা ও সংগীতশিল্পী নজরুল, জাতীয় কংগ্রেস জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সুরু করেছে, সেখানেও নজরুল, আবার যুবশক্তি ও ছাত্রশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতেও নজরুল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে, স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনতে হবে যে কোনও মূল্যে—নজরুলের ত্ব'চোখে তখন আগামীদিনের স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন, হিন্দু মুসলমানের মিলিত ঐক্যের ভারতবর্ষের সাধনায় তিনি তখন সদাব্যস্ত মানুষ। এরই মধ্যে বাঁকুড়ার যুব ও ছাত্রসমাজ কবিকে অভিনন্দন জানালেন, পুরোভাগে ছিলেন ছাত্রদরদী ও ভারতপ্রেমিক অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব ও তাঁর স্ত্রী মিসেস ব্রাউন। এঁদের ত্ব'জনের হাতে কবির ব্রিটিশ সরকার দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা বই—'বিষের বাঁশী' আর 'ভাঙ্গার গান' দেখে কবি চমৎকৃত হয়েছিলেন সেদিন।

১৯২৫-এর নভেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত একটি শাখা সংগঠন গঠিত হোল, নেতৃত্ব দিলেন নজরুল স্বয়ং আর সঙ্গী হোলেন কুতুবুদ্দীন আহ্‌মদ, হেমন্তকুমার সরকার, শামসুদ্দীন হুসয়ন—এই তিনজন। এই শাখা সংগঠনটি 'লেবার স্বরাজ পার্টি' বলে অভিহিত হোল, অফিস হোল ৩৭নং হ্যারিসন রোডে। দলের প্রথম ইস্তাহার চতুর্দিকে প্রচারিত হোল, প্রচারক কাজী নজরুল ইসলাম, আর এই প্রচারিত ইস্তাহারে সর্বপ্রথম দেশের কৃষিশ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকদের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার কথা বিস্তারিত বলা হোল সুস্পষ্টভাবে। ইস্তাহার প্রচারের একমাসের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৯২৫-এর

২৫শে ডিসেম্বর, বাংলা ১লা পৌষ, ১৩৩২ তারিখে এই শাখা সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে 'লাঙ্গল' কাগজটির জন্ম হোল। সাপ্তাহিক এই পত্রিকার প্রধান পরিচালক হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, সম্পাদক হোলেন মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়. পরবর্তীকালে স্বামী বিরূপাক্ষানন্দ নামে ইনি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক; 'লাঙ্গল' প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কবিগুরুর কাছে আশীর্বাণী চাওয়া হোল। তিনি লিখলেন—

জাগো জাগো বলরাম, ধরো তব মরু ভাঙ্গা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।

পর পর তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হোল লাঙ্গলের। প্রথম সংখ্যা ১৯২৫ এর ২৫শে ডিসেম্বর, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯২৬ এর ১লা জানুয়ারী, তৃতীয় সংখ্যা ১৯২৬ এর ৭ই জানুয়ারী। তারপর প্রকাশিত হতে লাগলো একটু ধীরগতিতে। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হোল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদ'। বিভিন্ন শিরোনামে বিভক্ত এই দীর্ঘ কবিতাটির উপশিরোনামগুলি তোমাকে একবার মনে পড়িয়ে দিচ্ছি অনিমেষ। ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, বারাঙ্গনা, নারী ও কুলিমজুর—এই ছ'টি উপশিরোনামে বিভক্ত দীর্ঘ কবিতা 'সাম্যবাদী' খুব স্বাভাবিক কারণেই জনচিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য কবি লিখেছিলেন 'কৃষকের গান' আর তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'সব্যসাচী'।

১৯২৫ এর শেষদিকে, বন্ধু কুতুবুদ্দীনের জন্য বসিরহাট উপনির্বাচনে প্রচার করতে গিয়ে নজরুল রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, যমে মানুষে টানাটানি স্থুরু হয়েছিল, অবশেষে তাঁর প্রচণ্ড জীবনী শক্তির জোরে সে যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন ঠিকই. তবে একদিকে অর্থনৈতিক চরম তুর্গতি, অপরদিকে ভেঙ্গে পড়া শরীর নিয়ে হুগলী ত্যাগ করার কথা ভাবলেন কবি। ১৯২৬ সালের ৩রা জানুয়ারী তিনি সবাইকে নিয়ে হুগলী ত্যাগ করে কৃষ্ণনগরে পৌছালেন, সাহায্য করলেন হেমন্ত কুমার সরকার। তাঁর সমস্ত দেনা মিটিয়ে দিলেন নিজে এবং উত্তর-

পাড়ার জমিদার অমর মুখোপাধ্যায়—উভয়ে মিলে আর কৃষ্ণনগরে গোলাপটি মহল্লায় নিজেদের একটা বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় নজরুলের থাকার ব্যবস্থা করলেন। শুধু তাই নয়, কবি পরিবারের খাবারদাবার আসতে লাগলো তাঁর বাড়ী থেকে আর হেমন্তবাবুরই অনুরোধে এলেন বিখ্যাত চিকিৎসক জে. এন. দে, ম্যালেরিয়ার মারাত্মক আক্রমণ ও ভগ্নস্বাস্থ্য থেকে তিনিই নজরুলকে পুনর্জীবন দিয়েছিলেন। জানো অনিমেষ, উচ্ছ্বাস আর আবেগময় কিছু কিছু নজরুল-জীবনীকার হেমন্তবাবুর এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর কবিপ্রীতির অপব্যাখ্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, মুজফ্ফর আহমদ এই অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বলেছেন; 'আসল ঘটনা কিছুই না জেনে যাঁরা তাঁর (হেমন্ত সরকার) এই উপকারকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রচার করেছেন, তাঁরা সত্যই তাঁর উপরে অবিচার করেছেন।' হুগলীর আড্ডায় বন্ধুরা আসতেন প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরা নজরুলের কবিতা আর গান শুনতে, নানান-ভাবে তাঁকে কাজে লাগাতে, কিন্তু চরম দুর্দিনে হেমন্ত সরকার না থাকলে নজরুলকে নতুন করে আমরা পেতাম না।

কৃষ্ণনগরে কবি ফিরে পেলেন তাঁর নতুন জীবন আর একের পর এক বিভিন্ন জনসভা, সম্মেলনে যোগ দিতে দিতে জনপ্রিয় হলেন কিছু দিনের মধ্যেই। এরই মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে পর পর কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোল কৃষ্ণনগরে আর প্রতিটি সম্মেলনেই নজরুল এক অপরিহার্য্য ব্যক্তিত্ব। তখন নজরুল ইসলাম, মুজফ্ফর আহমদ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সকলেই কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে রীতিমত যুক্ত। ১৯২৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে নজরুলের বিখ্যাত 'শ্রমিকের গান' পরিবেশিত হোল উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে। একটু শোনাই অনিমেষ, শুনলেই বুঝতে পারবে, তখনকার দিনে এই গানের মধ্যে কি উন্মাদনা ছিল—

ওরে ধ্বংসপথের যাত্রী দল ;
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।

আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙ্গব চল্।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

কিম্বা মনে কর ছাত্র সম্মেলনে উদ্বোধনী সংগীতরূপে নজরুলের সেই বিখ্যাত গান—

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
উর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল।
আমরা ছাত্রদল।

অথবা যুব সম্মেলনের সেই গান, যা বুকের রক্তে ঢেউ তোলে ছলাৎ ছলাৎ, বজ্র মুষ্ঠি উত্থিত হয় আকাশের দিকে, পায়ের তালে তালে বেজে উঠে শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের গর্জন—

চল্ চল্ চল্
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল।

আর তুমি তো জানো অনিমেষ, এই তিনটি সম্মেলন হয়ে যাবার পরেই সুরু হয়েছিল কংগ্রেসের মূল প্রাদেশিক সম্মেলন। ১৯২৬-এর ২২শে মে এই সম্মেলনে উদাত্তকণ্ঠে নজরুল সেদিন যে গান গেয়েছিলেন, তা আজো আমাদের বেঁচে থাকার, ঐক্যবদ্ধ হবার বীজমন্ত্র, 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার' পার হয়ে যাবার জন্য দৃপ্ত পদক্ষেপ আর জাতির জীবনে নেতৃত্ব দেবেন যে কাণ্ডারী, তার সামনে কবির অমোঘ ঘোষণা—

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্‌জন?
কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা উচিত—বর্ধমানের অল বেঙ্গল ইয়ং মেন্স মুসলিম কনফারেন্সে ১৯২৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এই গানটি গাওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা দাবী করেছেন প্রথম এই গান তাঁদের সম্মেলনেই গাওয়া হয়েছে—অপরদিকে কৃষ্ণনগরও তার দাবী অপরিবর্তিত রেখেছে। তবে ঘটনাসূত্র কৃষ্ণনগরকেই বেশী সমর্থন করে. কিন্তু বর্ধমানের দাবীকেও নস্যাৎ করা যায় না। হিন্দু মুসলমানের তৎকালীন দাঙ্গা, অপ্রীতি ও বিভেদ বিরোধের বিরুদ্ধেই নজরুল এই গান গেয়েছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নজরুলের এই গান গীত হয়েছে, কোথাও নজরুলের স্বকণ্ঠে কোথাও বা অপরের কণ্ঠে—জনপ্রিয়তার অধিকারী এই ঐক্য বোধের গান নিয়ে বিতর্ক থাকবেই, সেটাকেই আমরা স্বাভাবিক ভেবে নিতে পারি।

ইতিমধ্যে নজরুল বাড়ী পাল্টেছেন। স্টেশনের কাছাকাছি কৃষ্ণনগর চাঁদ সড়ক এলাকায় তিনি চলে এসেছেন এখন। সম্মেলনের হুজুগ কেটে যাবার পর কবির ঘরে ছায়ানুসারী অভাব, নিরন্ন পরিবেশ। তারই মধ্যে জন্ম নিল নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস আর ৯ই অক্টোবর ১৯২৬ এর দুপুরে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল। নজরুল তখন বাড়ীতে ছিলেন না, বেড়াতে গিয়েছিলেন শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, যশোহর, খুলনা—এই সব এলাকায়, জলবসন্তের আক্রমণকে পাশ কাটিয়ে হাল্কা প্রেমের উদাস হাওয়ায় গা ভাসিয়ে গোপনে ফল্গুনদীর মত সতত প্রবাহিত দুঃখের যন্ত্রণাকে উড়িয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কবি। ফিরে এসে দেখলেন জন্ম নিয়েছে এক সুন্দর শিশু, কবি তার নাম রাখলেন অরিন্দম খালেদ, ডাকলেন বুলবুল বলে। টাকা চাই, চিঠি লিখলেন বন্ধু প্রকাশক ব্রজবিহারী বর্মণকে, বন্ধু মুরলীধর বসুকে, আরো অনেককে—যার যতটুকু সাধ্য পাঠিয়েও দিলেন টাকা, অধ্যাপক হেমচন্দ্র দত্তগুপ্তও যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। অসীম যন্ত্রণার সাগরে ভাসছেন কবি, তবুও তার মধ্যে নীরবে সবকিছু সহ্য করেছেন প্রমীলা

দেবী, শাশুড়ী গিরিবালা দেবী—কোনও দিন নজরুলকে তোমার আমার মত বাক্যবাণে জর্জরিত হতে হয় নি, এটাও তাঁর কম পাওনা ছিল না।

এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচনে কারো সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে প্রার্থী হলেন নজরুল—হয়তো ভেবেছিলেন এর ফলে তাঁর সব অভাব ঘুচে যাবে, তিনি দেশবরেণ্য নেতা হবেন, তাঁর সাহিত্যচর্চা আর সাংবাদিকতার প্রসার ঘটবে। কবিরা অংক আর প্রাত্যহিক জীবনের মুদিখানার হিসেব বোঝেন না, সহজসরল সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখেন আর চিরকালই এমনি করেই তাঁরা যুগে যুগে বঞ্চিত হন, প্রতারিত হন—এইটাই কবিচরিত্র, অনিমেষ। মুজফ্ফর আহমদ বোঝালেন নজরুলকে, সরে যেতে বললেন নির্বাচন থেকে, কিন্তু ১৮,১১৬ জন ভোটারের নেতা হবার বাসনায় ব্যস্ত কবি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে তিনশ টাকা আদায় করে এনেছেন, ভোটে দাঁড়ালেন আর হেরেও গেলেন, লাভের মধ্যে পেলেন আরো কিছু অতিরিক্ত দেনা।

হাসিকান্নায়, পতনে উত্থানে, অন্নে অন্নাভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে চলে গেল ১৯২৬ সাল। যায় ১৯২৭ এর দুঃখেভরা মাসগুলি। এরই মধ্যে ১৯২৭ এর ১৩ই মার্চ বুলবুলের অন্নপ্রাশনে কবি নিমন্ত্রণ করলেন দিকে দিকে, সে ভোজসভায় আবার নতুন দেনা। আর এরই ভেতর অবিরত লেখা চলেছে—লিখছেন কবিতা, প্রবন্ধ, গান আর নতুন আঙ্গিকের গজল। নজরুল তাঁর এক বন্ধু আবুল হোসেনকে এই সময় এক চিঠিতে লিখলেন; 'আমার সরস্বতী অশ্রুমতী—বেদনা শতদলে তাঁর চরণ।...চোখের জলে ধোওয়া সে সুর। বেদনায় রাঙা সে হাসি। আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না। আমার সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্বশী নয়, মর্ত্যের শকুন্তলা—বিরহ শীর্ণা অশ্রুমুখী পরিত্যক্তা শকুন্তলা, উৎপীড়িতা লায়লী।'

জানি অনিমেষ, তোমার চোখে এখন অপরিসীম বেদনার দু' ফোঁটা জল চিকচিক করে উঠেছে তোমার অজান্তেই। বুকের ভেতরে

কি গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় নত হয়েছ তুমি। একদিকে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে, যাবতীয় কুসংস্কার, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যলোভী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষী বিদ্রোহ আর এক দিকে প্রেমের ঝর্ণাধারায়, গানে গানে গজলে প্রাণ ব্যাকুল করে দেবার মত অবিস্মরণীয় সৃষ্টি—তারই মাঝখানে দু'মুঠো ভাত, একটু দুধ, একটু নিরিবিলি শান্তির জন্যে নিরবধি সংগ্রাম—কবি নজরুলের এই ছবিতে তুমি তো আকুল হবেই, সেটাই তো ধর্ম অনিমেষ। সারাটি জীবন ধরে 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলতে বলতেই নজরুল আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, নিঃশব্দ নীরবে অজস্রতে রক্ত ঝরিয়েছেন প্রতিনিয়ত, আর আমরা এতদিন পরেও সেই রক্ত ঝরানোর মানে বুঝতে পারিনি, তাঁর আদর্শ-অনুসারী হতে পারি নি, এর চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে? কবির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যখন আমাদের উচিত ছিল সহযোদ্ধা হওয়া, তখন আমরা তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলেছি—যখন বলা উচিত ছিল এ দেশ হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের, তখনই আমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছি। আমরা তাঁর পাশে থাকলে সমালোচনার তিক্ততা আর অর্থনৈতিক রিক্ততায় তাঁকে নিঃস্ব না করে দিলে, দেশ ও জাতি আরো অনেক স্থায়ী সাহিত্য সম্পদের অধিকারী হোত অনিমেষ—কিন্তু না, আমরা তখন সে কথা ভাবি নি।

১৯২৭ এর জুন মাসে আফজালুল বের করলেন 'নওরোজ' মাসিক পত্রিকা, নজরুল ইসলাম এর প্রধান পরিচালক। এতেও তাঁর বেশ কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। মাঝে একবার স্বামী রামানন্দ নাম নিয়ে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একেবারে কপর্দকহীন অবস্থায় বেড়িয়ে এলেন ঢাকা, বুদ্ধদেব বসুর ভগ্নীপতির বাড়ীতে থেকে, হাত দেখে, ভক্তিগীতি গেয়ে, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদের বিভিন্ন উপদেশ ব্যাখ্যা করে আবার ফিরে এলেন কৃষ্ণনগর। আবার ঢাকা থেকে আমন্ত্রণ এলো—১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন করলেন তিনি।

এখানে এবারে এসে তাঁর পরিচয় ঘটল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতির সঙ্গে। আলাপ হোল হাসাড়া গ্রামের বুদ্ধিমতী রাণু সোম, মৈত্রকন্যা উমা, উন্নতশির মুসলিম যুবতী ফজিউল উন্নেসা প্রভৃতি অনুরাগিণীর সঙ্গেও। প্রচার, অপপ্রচারে কবির জীবন ঢাকায় দুর্বিষহ হয়ে উঠলো, অনেক কুড়িয়ে পাওয়া ভালবাসা, অনেক না পেতে চাওয়া অপবাদ মাথায় নিয়ে বেদনাবিধুর কবি ফিরে এলেন ফেব্রুয়ারী মাসের ২৪ তারিখে। পরবর্তীকালে অপাপবিদ্ধা রাণু সোমই বিবাহিতা হয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে, নিজেও লেখিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন প্রতিভা বসু নামে।

ইতিমধ্যে গান গেয়ে গেয়ে আর দিনরাত রাতদিন আবৃত্তি করে নজরুলের গলায় ক্ষত দেখা দিয়েছে, জ্বর আসে প্রায়ই, শরীরের ভেতরে কেমন যেন এক দাহ, অব্যক্ত বেদনা। সব কিছুকে উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে চলেন দুর্বার গতিতে। প্রমীলা ইসলাম তখন আবার সন্তানসম্ভবা—বন্ধু শান্তিপদ সিংহের চেষ্টায় নজরুল আবার বাসা পাল্টালেন, উঠে এলেন এণ্টালীর ৮। ১ পানবাগান লেনে আর এখানে এসেই জন্ম হোল সানৃঈয়াত সেন ওরফে সানির অর্থাৎ সব্যসাচীর। পরবর্তীকালে কবি এই বাড়ীটিও ত্যাগ করেছিলেন, বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের বাসা ১৫ নং জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীটে উঠে এসেছিলেন কয়েক মাসের জন্যে, আর এখানেই জন্ম নিয়েছিল লেলিন ওরফে নিনি অর্থাৎ অনিরুদ্ধ। নজরুলের মত শতমুখী প্রতিভা ছিল না ঠিকই কিন্তু পরবর্তী সময়ে কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধকে কবির সার্থক উত্তরসাধক হিসেবে আমরা পেয়েছি।

—০—

চার

বেদনার সাগর মথিত করে অমৃত উঠে আসে. আসে বিষও। অনিমেষ, তুমি তো জেনেছ, নজরুল এই বেদনার সাগর থেকে বিষ পান করেছেন অবহেলায়, জাত পাতের উর্ধে মানবতা প্রতিষ্ঠায় সাধনায় মগ্ন তাঁকে রক্ষণশীল হিন্দুরা বলেছে বিধর্মী আর মুসলমান মৌলবীরা বলেছে কাফের. নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে যুদ্ধ করেছেন সীমাহীন অভাবের সঙ্গে। আর এরই মধ্যে পানবাগান থেকে উঠে আসার পর প্রথম পেলেন শান্ত অমৃতের সন্ধান—প্রতিষ্ঠিত হবার আরেক সুন্দর সুযোগ এলো সামনে।

মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, '৮। ১, পানবাগান লেনের বাড়ীতে আসার পরে কাজী নজরুল ইসলামের সামনে একটি নূতন দিগন্ত খুলে গেল—সুর ও সঙ্গীতের দিগন্ত।···তখন সে সঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার রচিত গান তারই দেওয়া সুরে সুরশিল্পীরা সর্বত্র গাইছেন কিন্তু ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানীর নিকটে সে ছিল সম্পূর্ণ বর্জিত।' কিন্তু নজরুলের জনপ্রিয়তা, গ্রাহকদের নজরুলগীতির জন্য চাপ সব মিলিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানী বিব্রত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে হরেন্দ্র ঘোষ কোম্পানীকে না বুঝতে দিয়ে নজরুলের কয়েকটি গান রেকর্ড করেছিলেন স্বকণ্ঠে। পরে জানতে পেরে গ্রামোফোন কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ভগবতী চরণ ভট্টাচার্য্য খুশী হয়েছিলেন, নজরুলকে এক সঙ্গে কয়েকশত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গানের রয়্যালটি বাবদ এবং আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন গান গাইতে। নজরুল গিয়েওছিলেন বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে, অনেক আলাপ আলোচনার পর রয়্যালটি চুক্তিতে নজরুল সংগীত-রচয়িতা, সুরস্রষ্টা ও সংগীত শিক্ষক হিসাবে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগ দিলেন—অভাব মুক্তির একটা পথ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে তাঁর সে কি আনন্দ, বুলবুল আর সানিকে কি আদর। সকলেই খুশী, দুঃখের সততপ্রবাহ সাময়িক বন্ধ হোল ভেবে।

এতকাল নজরুল গান শিখেছেন লতা পাতা ফুল পাখীর কাছে, প্রকৃতির শিক্ষালয় থেকে। ঝরণার শব্দে, নদীর ছন্দে, পর্বতের উদার মৌনতায়, অরণ্যের হাতছানিতে কবি এতকাল খুঁজে পেয়েছেন তাঁর গানের ভাষা, সুর, আউল বাউলের গানে, পথচারীদের লোকসংগীতে পেয়েছেন অমৃত-ঐশ্বর্য্য—এখন তাঁর মনে হোল আনুষ্ঠানিকভাবে একজন ওস্তাদের কাছে গানের ব্যাকরণ শিখে নেওয়া দরকার। নজরুল ঐ গ্রামোফোন কোম্পানীর চীফ মিউজিক ট্রেনার ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খানের কাছে ঠিক গান শিখতে নয়, সুর ভাণ্ডারের আরোও আস্বাদ পেতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য ত্যাখো অনিমেষ, পরবর্তী কিছুকালের মধ্যে নজরুলই হয়ে উঠলেন ওস্তাদের ওস্তাদ। নজরুল তাঁর 'বনগীতি' সংগীত গ্রন্থটি কিন্তু উৎসর্গ করেছেন এইভাবে —'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিদ, আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে—' আর তারপর তাঁকে উদ্দেশ্য করে বারো লাইনের একটি সুন্দর কবিতাও লিখেছেন সেই উৎসর্গপত্রে।

নজরুলের গান যেন লক্ষ মানুষের হৃদয়ের মর্ম্মবাণী। পিতৃ প্রসঙ্গে কাজী অনিরুদ্ধ বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল এলেন বিদ্রোহীর বেশ ধরে, কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি যেন মধ্যপ্রাচ্যের সুরা ও সাকী; খেজুর গাছ, প্রখর রৌদ্র এবং ওয়েসিসের শ্যামলিমা নিয়ে তিনি হাজির হলেন।' অনিরুদ্ধ-স্ত্রী, প্রখ্যাত শিল্পী কল্যাণী কাজী বলেছেন, 'তাঁর গান যেন অন্তরের গভীরে অনাবিল আনন্দের স্পর্শ ঘটায়।' হারীন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মানব দরদী নজরুল তাঁর বুকে জমাট করে রেখেছেন প্রপীড়িত মানবতার দুঃখ বেদনার গান। এ মরমী সংগীত যে হৃদয়ে ঝংকৃত হয়েছিল, তা আকাশেরই মত উদার, প্রশান্ত সাগরের মত প্রমত্ত, দুর্বার। কাজীর জীবনে, গানে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিলন শতদল—অপরূপ সৌগন্ধে ও মধুরিমায়। কাজী একাধারে এক ভিখারী ও সম্রাট। কাজী এক মহিমময় রাজ-ভিখারী।' নজরুল

এক চিঠিতে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লিখলেন, 'জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাবো আমি। দিয়ে যাবো আমি নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।' এই কথাকে সমর্থন করে সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'নজরুলের সুরের আঘাতে বিশ দশকে ঘুমন্ত মানুষ জেগেছে। বাংলার বিপ্লবীদের কণ্ঠে তিনি দিলেন গান। ভাঙ্গার আবেগ আর সৃষ্টি সুখের উল্লাসের এ গান দেশের যুব সমাজকে ঘরের বার করে আনলো।' মুজফফর আহমদ লিখেছেন, 'উনিশ শ' ত্রিশের দশকে আমাদের দেশকে সে অপূর্ব অবদান দিয়ে গেছে। সুরের সৃষ্টিতে সে অভুতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সঙ্গীত রচনায় তার তুলনা নেই।'

ধ্যানমগ্ন নজরুল তখন আত্মহারা সঙ্গীতজগতে, পায়ের তলার নরম মাটি ক্রমশঃ শক্ত হচ্ছে তাঁর, অভাব ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে সরে যাচ্ছে পিছনের দিকে। এরই মধ্যে একবার চট্টগ্রাম, সেখান থেকে অন্তরতম সুহৃদ মুজফ্ফর আহ্মদের বাড়ী সন্দ্বীপ বেড়িয়ে এসেছেন তিনি।

কলকাতা বড় রহস্যময়ী অনিমেষ। তাকে যে ভালবাসতে পারেনি তার চোখ নেই, আবার যে ভালবেসেছে সে চোখ হারিয়েছে। আর কলকাতা যখন কাউকে ভালবাসে তখন সে প্রাণ ঢেলে দেয় তার জন্যে। কলকাতার প্রেমে প্রেমিক নজরুলকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে কলকাতা, জয়মাল্য আর চন্দনের টিপ জ্বলজ্বল করছে নজরুলের গলায়, কপালে। অফুরাণ ভালবাসায় বিভোর নজরুলের জন্য সেজেছে সেদিন এ্যালবার্ট হল। বাংলা ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ইংরাজী ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখটা ভুলে যেও না অনিমেষ, সেদিন আমাদের প্রিয় বিদ্রোহী কবি, গানের রাজাধিরাজের জাতীয় অভিষেকের দিন। লোকে লোকারণ্য ঐ সম্বর্ধনাসভায় সভাপতি বিজ্ঞানী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, অভ্যর্থনা সমিতির

সভাপতি এস. ওয়াজেদ আলি। ফুলে ফুলে ঢাকা এক মোটরকার থেকে নামলেন চুরুলিয়ার শ্বেতপদ্ম, বাংলার বুলবুল, বিশ্বের অন্যতম প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। জয়ধ্বনি ধ্বনিত হল চারিদিকে, পুষ্পবর্ষিত হোল, বেজে উঠলো শাঁখ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন, 'নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি এই ভেবে বিপুল আনন্দ অনুভব করছি যে নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি বাঙালীর কবি।… আজ নজরুল ইসলামকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন তা বাঙ্গালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।' মানপত্র পাঠ করলেন এস. ওয়াজেদ আলি, তিনি পড়লেন,—'ধূলার আসনে বসিয়া মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়নসাগরে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথা বিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি। চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার মানুষের নমস্কার।' প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র তেজদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা যখন যুদ্ধে যাব, তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।…কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্বপ্ন।' নলিনীকান্ত সরকার ও উমাপদ ভট্টাচার্য্য গাইলেন নজরুল বন্দনা—

ঝটিকা ক্ষুব্ধ সরসীতে তুমি
সুন্দর সিত শতদল
সন্ধ্যার শ্যাম-সুষমাতে তব
অন্তরে সুধা পরিমল।

এই মহান সম্বর্ধনার উত্তরে নজরুল শোনালেন কয়েকটি বাছাইকরা

গান আর আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, "আপনারা যে সওগাত আজ আমার হাতে তুলে দিলেন, আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটিমাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, 'আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।" বললেন, 'বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।... আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে, বাঁকে বাঁকে কুটিলফণা ভুজঙ্গ, প্রখর-দশন শার্দুল, পশুরাজের ভ্রূকুটি এবং তাঁদের নখর ও দংশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।...আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের।...'

ভালবাসা আর মায়ার বন্ধনও অটুট নয় অনিমেষ। পড়ে থাকে স্মৃতি, চলে যায় বিশ্ব-চরাচর। আমরা কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারি না। আল্লাহতালার অমোঘ নির্দেশে, মহাকালের কঠোর অনুশাসনে, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের অনিবার্য আদেশে আমরা সবাই মহাশূন্যে হারিয়ে যাই। এবারে অনিমেষ ক্রমশঃ আমি বুলবুল প্রসঙ্গে আসবো আর যখন আমার বলা শেষ হবে তখন কান্নার ঢেউ-এ তোমাকে আমাকে সবাইকে ভাসতেই হবে—এরই নাম পরিণতি, এরই নাম নিয়তি।

প্রাণাধিক প্রিয় বুলবুল তখন প্রায় চার বছরের। ১৯৩০ সালের ১লা মে বুলবুল জলবসন্তের শিকার হোল, সারা শরীর জুড়ে বসন্তের জ্বালাময়ী আক্রমণে ছটফট করছে সে আর ততোধিক ছটফট করছেন নজরুল, দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন গিরিবালা দেবী, মা প্রমীলা। চোখের ভেতরেও বসন্তের গুটিতে বুলবুল দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছে তখন। আর এইভাবেই যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত সৈনিক বুলবুল হারিয়ে গেল এই ভালবাসার পৃথিবী থেকে, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ, ইংরাজী ১৯৩০ সালের ৭ই মে কবি বুলবুলকে হারালেন চিরকালের মত। বুলবুলের রোগযন্ত্রণার সুরু থেকে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত

নজরুল তার পাশে বসেছিলেন, অক্লান্ত সেবা করেছেন আর 'রুবাইয়াৎ ই-হাফিজ' এর কাব্যানুবাদ করেছেন। বুলবুল সেই কচি বয়সেই ছিল সুরের যাদুকর, মিষ্টি কথার কারিগর, তার মৃত্যুতে কবি এত বেশী আঘাত পেলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াল। আর জেলে বসে কাঁদছিলেন বুলবুলের 'জ্যাঠামশাই,' মুজফ্ফর আহ্মদ। দেবদুর্লভ এই শিশুটিকে হারিয়ে তিনিও যেন সেদিন যন্ত্রণায় মূক হয়ে গিয়েছিলেন।

নজরুল তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' উৎসর্গ করলেন বুলবুলের নামে। বইটি ছাপা হচ্ছিল কালিকা প্রেসে, প্রকাশিত হবার পর বইটিকে বুকে চেপে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি। আর এদিকে প্রমীলা আর গিরিবালা দেবী শোকে যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিলেন ক্রমশঃই।

বেশ কিছুকাল পর প্রকাশিত হোল 'প্রলয়-শিখা' আর বইটি বিদ্রোহাত্মক দেখেই ব্রিটিশ সরকার সেটি বাজেয়াপ্ত করলো। অশান্ত নজরুল কি করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না, বুলবুলের মৃত্যু তাঁর চিন্তা সংগতির ওলটপালট ঘটিয়ে দিয়েছিল, একবার ছুটলেন লালগোলা হাই স্কুলের হেডমাস্টার তান্ত্রিক সাধক বরদাচরণ মজুমদারের কাছে। নিমতিতা গ্রামের বিয়েবাড়ীতে তাঁর সঙ্গে গভীর আলাপ করে নজরুল আগেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলেন, লালগোলায় এসে বরদাচরণের কাছে চাইলেন শোক ভোলার মন্ত্র, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পাওয়ার পথনির্দেশ, চাইলেন যোগদীক্ষা। কবি, বরদাচরণের নির্দেশে ধ্যানে বসলেন, দেখলেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া পুত্রকে। নজরুল এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আজ আমার বলিতে দ্বিধা নাই, তাঁহারই পথে চলিয়া আজ আমি ···আমাকে চিনিয়াছি।···আমি ধন্য হইলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি অসত্য হইতে সত্যে আসিলাম, তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে অমৃতে আসিলাম।'

আমার কি মনে হয় জানো অনিমেষ, নজরুল হয়তো অতিরিক্ত শোকে এক বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছিলেন সেইসময়। যোগী

বরদাচরণের যোগসাধনের প্রতি গভীর বিশ্বাস রেখেও ধ্যানে বসামাত্র নজরুল তাঁর মৃত পুত্রকে আবার দেখতে পেয়েছিলেন এমন কথায় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকের ধারণা নজরুলের পরবর্তী জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতি ও বাকরুদ্ধতার কারণ এই যোগাভ্যাস করতে যাওয়া। অথচ গৃহীযোগী বরদাচরণের সংস্পর্শে আসার পর নজরুলের মানসিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল. স্পষ্ট বুঝতেও পারছিলেন সবাই। গভীর রাত পর্য্যন্ত ধ্যান, প্রাণায়াম, আসনে মগ্ন থাকতেন নজরুল। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, শাক্তমতের প্রতি তাঁর অনুরাগ এই সময় রীতিমত বেড়ে উঠেছিল। এরই মধ্যে সিনেমা জগতে 'ধূপছায়া' নামে একটি চলচ্চিত্র পরিচালক হলেন তিনি, বিষ্ণুর ভূমিকায় অভিনয় করলেন নিজে, লিখলেন বৈষ্ণব প্রেমের আকুল করা গান। ১৯৩২ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীর চীফ মিউজিক ট্রেনার জমিরউদ্দীন খান পরলোকগমন করলে নজরুল এই পদটিতে অধিষ্ঠিত হোলেন। অধ্যাত্ম চেতনায় ভরপুর নজরুল তখন একের পর এক লিখে চলেছেন শ্যামাসংগীত, কীর্তন, ইসলামী ভক্তিগীতি আর তারই সঙ্গে গজল, আধুনিক গান, হাসির গান, প্যারডি, নাচের গান, পল্লীগীতি আর নিজস্ব ঢং-এ প্রাণ জুড়ানো নানান গানের মালা। এই সময় তাঁর কাছ থেকে যাঁরা গানে দীক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আঙ্গুরবালা, কাননদেবী, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, সরযুবালা, সুপ্রভা সরকার, কমল দাশগুপ্ত, শচীনদেব বর্ম্মন, মৃণালকান্তি ঘোষ, আব্বাস-উদ্দীন, চিত্ত রায়, ধীরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে।

নাট্যকারের কাছে ও নাট্য সংস্থাগুলিতে নজরুলের গানের চাহিদা তখন তুঙ্গে। মন্মথ রায়ের 'কারাগার', 'মহুয়া', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা, রক্তকমল প্রভৃতি নাটকে, প্রবোধ কুমার সান্যালের শ্যামলীর স্বপ্ন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ব্ল্যাক আউট, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাহাঙ্গীর। বন্ধু শৈলজানন্দের চলচ্চিত্র নন্দিনী প্রভৃতিতে তিনি যে সব গান লিখেছিলেন তার অধিকাংশই লোকের মুখে মুখে ফিরতো

তখন। ১৯৩১ এর ডিসেম্বরে নাট্য নিকেতন মঞ্চে নজরুল রচিত 'আলেয়া' নাটকটির অভিনয় সমাদৃত হোল। ১৯৩৫ সালে ধ্রুব চলচ্চিত্রে ১৭টি গান লিখলেন নজরুল আর নিজে অভিনয় করলেন নারদের ভূমিকায়। শৈলজানন্দের 'পাতালপুরী' রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হোলেন। 'বিদ্যাপতি' ও 'সাপুড়ে' নামে দু'টি চিত্রকাহিনী লিখলেন তিনি, পরবর্তীকালে এগুলিও জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। কিন্তু ভেবে দ্যাখো কি দুর্ভাগ্য অনিমেষ, এই জনপ্রিয়তা নজরুলকে অর্থ দিল না, বরং নতুন করে বন্ধুদের স্বাগত জানানো, খাবার খাওয়ানো ইত্যাদিতে দেনায় জড়িয়ে দিল—অথচ সেই সময় যাঁরা নজরুলকে নানান কাজে লাগিয়ে নিচ্ছিলেন আর ফরমায়েসী গান লিখিয়ে নিচ্ছিলেন তাঁরা যদি নজরুলের অন্তঃসলিলা মানসিক পরিবর্তনের কথা একটু ভেবে দেখতেন সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করতেন, তাহলে হঠাৎ বৈরাগ্যের হাওয়ায় নজরুল গা ভাসাতে পারতেন না, হয় তো আরো দীর্ঘদিন ধরে সুস্থও থাকতেন।

এই সময় নজরুলের সংগীত সাধনায় একটি লুপ্তপ্রায় সংগীত শিক্ষার পুস্তক খুবই কাজে এসেছিল। আরবী ঘেঁষা উর্দুতে রচিত এই অতুলনীয় পুস্তক মারিফুন্নগমাতের লেখক রাজা নবাব আলী ছিলেন ১৯১৬-২৬ সালে একজন দেশবিখ্যাত সংগীত সাধক। নজরুল এই বইটির ভাবানুসরণ করেছিলেন কিন্তু নিজের চিন্তাধারা যোগ করে তার মানোন্নয়নও করেছিলেন। বলা যেতে পারে নজরুল-গীতির নব নব শাখার বিন্যাসে এই বইটি খুবই কাজে লেগেছিল তাঁর।

তুমি বোধহয় শুনে অবাক হবে অনিমেষ, গ্রামোফোন কোম্পানীর চালাকির ফাঁদে পা দিয়ে নজরুল ১৬ নং বিবেকানন্দ রোডে 'কলগীতি' নামে এক রেকর্ড বিক্রীর দোকান খুলেছিলেন ১৯৩৪ সালে আর তথাকথিত বন্ধুরা ধারে রেকর্ড কিনে, চা পান খেয়ে সেই দোকানের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে আরেকবার নজরুলকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। ভাবে ভোলা গৃহী সন্ন্যাসী অগ্নিতাপস নজরুলের জীবনে

এই 'কলগীতি'ও বড় 'বেদনাগীতি' হয়ে বেজেছিল, মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েও সব সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে শুধুমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে।

'কলগীতি' খোলার কিছুদিন আগে নজরুল একটি ছোট মোটর গাড়ি কিনেছিলেন। তাতে চেপে ঘুরে বেড়ান বন্ধুদের নিয়ে—তেল মবিল আর চা-জল খাবার, সে তো নজরুলের খরচ, স্ফূর্তি করবে আর সবাই। হঠাৎ একদিন গাড়ী বিক্রী করে নজরুল কিনলেন বিরাট বড়ো এক মোটরকার। তখন তাঁর হাতে নানান দিক পয়সা আসছে, গ্রামোফোন কোম্পানীর রয়্যালটি, নতুন কোম্পানী মেগাফোনের রয়্যালটি, বই বিক্রীর টাকা, নগদে কিম্বা ধারে রেকর্ড বিক্রী, সব মিলিয়ে নজরুলকে তখন পায় কে! মনের সুপ্ত ইচ্ছা, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে একটু সুখের ইচ্ছে নজরুলকে আরো দেউলিয়া করে দিল ভেতরে ভেতরে। কিন্তু কে বোঝাবে তাঁকে, মুজফ্ফর আহমদ তখন কখনও জেলে, কখনো আত্মগোপন করে আছেন, শৈলজানন্দ তখন লেখা আর চলচ্চিত্র সাধনায় ব্যস্ত, নজরুলের চারপাশে তখন ভক্ত এবং স্তাবকের ভীড়। এরই মধ্যে ১৯৩৮ সলে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেবার ডাক এলো। সংগীত পরিচালক কবিবন্ধু সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী অনিচ্ছুক নজরুলকে একরকম জোর করেই নিয়ে এলেন বেতারে। এখানে এসে নজরুল আর এক বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে ডুবে গেলেন। লিখলেন অসংখ্য গান আর কবিতা, পরিচালনা করতে সুরু করলেন তিনটি বিভাগ—হারামণি, নবরাগ মালিকা ও গীতি বিচিত্রা। আর এই বেতার জীবনে কবি ক্রমশঃই বন্ধুবান্ধব, সভাসমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন গভীর ভাবে, ডুবে থাকলেন সুর সৃষ্টির মৌন তপস্যায়।

অনিমেষ, এখন এই মুহূর্তে তোমার মনে তবু একটু স্বস্তির আনন্দ, নজরুল তাঁর অভাব অনটনের করুণ দিনগুলি পার হচ্ছেন ধীরে ধীরে, সংসারে সুখ নামের চঞ্চল পাখীটা বাসা বাঁধছে, গিরিবালা দেবীর ঈশ্বরবিশ্বাস, প্রমীলা ইসলামের স্বামীগর্বে আনন্দিতা মুখ, সানি আর নিনির আনন্দমুখর ছেলেবেলা—ভাবতে হয়তো খুবই ভালো লাগছে

তোমার। কিন্তু তুমি তো চোখ মেলে দ্যাখো নি অনিমেষ, 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের' এই সাময়িক শান্তিকে উড়িয়ে দিতে কি বিরাট দুঃখবাদী ঝড় ছুটে আসছে গর্জন করে। যদি দেখতে, ভয়ানক চমকে উঠতে, পারলে হয় তো যথা সর্বস্ব দিয়ে তার পথ আটকে দিতে তুমি। না অনিমেষ, আমরা সবাই হেরে গিয়েছি ঐ সর্বনাশা দুঃখবাহী ঝড়ের কাছে হেরে গেলেন নজরুলও। এই ১৯৩৮ সালে অসুস্থ হলেন মাতৃসমা বিরজা-সুন্দরী, সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন অমরলোকে। সবচেয়ে বেশী আঘাত পেলেন প্রমীলা, মনে মনে কাঁদতেন সবার অগোচরে। একবছরও গেল না, ১৯৩৯ এর জুন-জুলাই মাস নাগাদ প্রমীলা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, শরীরের নিম্নাঙ্গ ক্রমশঃ অসাড় হয়ে গেল, হঠাৎই স্থায়ী পক্ষাঘাতে অচল হয়ে গেলেন তিনি। প্রমীলা যত না কাঁদেন, তার চেয়ে বেশী কাঁদেন নজরুল। প্রাণপ্রতিমার এই অবস্থায় মনের তীব্র আঘাতে নজরুলের মাথার ভেতর তীব্র যন্ত্রণা সুরু হোল, তিনি তারই মধ্যে প্রমীলাকে সুস্থ করে তোলার জন্য ছুটলেন একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি, হেকিমী, আয়ুর্বেদিক, ঝাড়ফুঁক, বীরভূমের বেলে গ্রামের দৈব ওষুধ, কালীমন্দিরে পাঁঠামানত, পূজা, হোম, কোরাণ পাঠ—কিছুই বাদ দিলেন না। মোটর গাড়ী বিক্রী হয়ে গেল, একটুকরো জমি ছিল বালিগঞ্জে—তাও গেল, একের পর এক গ্রন্থস্বত্ব বিক্রী হয়ে গেল, যাবতীয় রয়্যালটি বাঁধা দিলেন ব্যবহারজীবি অসীম কৃষ্ণ দত্তের কাছে মাত্র চার হাজার টাকার বিনিময়ে কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না, প্রমীলা সুস্থ হলেন না। নজরুল একবার দৌড়ান দক্ষিণেশ্বরে, ধরণা দিয়ে পড়ে থাকেন, আবার দৌড়ান তারকেশ্বরে, আকুল কান্নায় গড়াগড়ি খান, খবর পেয়েই দৌড়ান ডায়মণ্ডহারবারে এক সাধুর কাছে আবার সিন্নি চাপিয়ে আসেন পীর সাহেবের মাজারশরীফে—সবই প্রমীলার জন্য। প্রমীলা তাঁর স্বপ্ন, তাঁর প্রিয় প্রেম, তাঁর ভালবাসা—কেবলই কেঁপে ওঠে স্ফুরিত অধর, ডাগর চোখ ভরে আসে জলে আর আস্তে আস্তে কবি নজরুল, সংগীত-কার নজরুল তলিয়ে যেতে থাকেন অধ্যাত্মবিশ্বাসের সমুদ্রে। ধ্যান-

ধারণায় প্রমীলা আর চেতনার গভীরে ঈশ্বর, তিনি কখনো বা শ্যাম, কখনো বা আল্লাহ—এর বাইরে আর কিছু নয়, দুর্দম সিংহ এখন বড়ো ক্লান্ত অনিমেষ, অগ্নিতাপস বড় শ্রান্ত এখন।

নজরুলের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ। রবিকবির স্নেহধন্য কবি নজরুল। একে অপরের মনের গভীরে অনড় আসনে বসে আছেন। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ এরই মাঝে কয়েকবার খবর নিয়েছেন নজরুলের। আর এরই মধ্যে এলো জাতির জীবনে এক মহাপ্রয়াণের বেদনাময় দিন, ইংরাজী ১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই প্রিয় বিশ্বকবিকে হারালাম আমরা। নজরুল শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, বেতার কেন্দ্রে বসে বসে লিখলেন 'রবিহারা' নামে এক দীর্ঘ কবিতা, লিখলেন অনবদ্য এক শোকগীতি 'রবিহারার কয়েকটি ছত্র সারাজীবন মনে রেখে দেবার মতো—

…শ্রাবণ মেঘের আড়ালে টানিয়া গগনে কাঁদিছে রবি,
ঘরে ঘরে কাঁদে সব নরনারী, 'ফিরে এসো আমাদের কবি'
ভারত-ভাগ্য জ্বলিছে শ্মশানে, তব দেহ নয়, হায়
আজ বাঙলার লক্ষ্মীশ্রীর সিঁদুর মুছিয়া যায়।…
এত আত্মীয় ছিলে তুমি, বুঝি আগে বুঝে নাই কেহ
পথে পথে আজ লুটাইছে কোটি অশ্রু-সিক্ত দেহ।…

বেতারে প্রচারিত হোল এই কান্না ভেজা কবিতা, কান্নায় ভরা গান। আর ভেতরে নিঃশেষ হলেন নজরুল। যেন চোখের সামনে থেকে সরে গেল আদর্শের একমাত্র দীপশিখা, সামনে বিপুল অন্ধকার। আত্ম-বিশ্বাসে, সাহিত্যের অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও নজরুল নিজেকে বড় অসহায় ভাবলেন সেদিন আর মাথায় যন্ত্রণাও বেড়ে গেল তীব্রভাবে।

—প্রমীলা তখন নিজেকে তৈরী করেছেন অন্যভাবে। পক্ষাঘাত তাঁকে শয্যাশায়ী করলেও তাঁর মন আর ভালবাসাকে কেড়ে নিতে পারে নি। একদিকে প্রেমময়ী স্ত্রী, অপরদিকে মমতাময়ী জননী আবার গিরিবালার আদরের দুলালী দোলন তিনি—শুয়ে শুয়েই একদিকে কাত হয়ে সংসারের সব খুঁটিনাটি সামলান, সকলের খোঁজখবর রাখেন। নজরুল এক একদিন সব কাজ ফেলে প্রমীলার কাছে বসেন আবার

নিঃশব্দে চলেও যান বেতারকেন্দ্রে। নেমে এলো আরো বিপর্যয়, মানসিক আঘাত নজরুলকে দুর্বল করে দিচ্ছিল সকলের অজ্ঞাতসারে। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখছেন, 'নজরুলের রোগের প্রথম সূচনা কখন হয়েছিল তা বলা কঠিন। সে নিজে নিশ্চয় তার ভিতরে রোগের এই আবির্ভাবটা অনেক আগে টের পেয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে যদি কোনো বিশিষ্ট চিকিৎসকের নিকটে যেত, তা হলে আজ আমাদের দেশ তাকে এইভাবে হারাত না।' সত্যিই অনিমেষ, নজরুল কেমন যেন শ্মশান বৈরাগ্যে উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন, বুলবুলের মৃত্যু, অভাবের তীব্রতা, গলক্ষতের যন্ত্রণা, বন্ধুদের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা, অধ্যাত্ম জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আকাঙ্খা, প্রমীলার পক্ষাঘাত, রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ—সব মিলিয়ে নজরুল নিজের বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাকে কবর দিয়েছিলেন অনেক আগেই।

বাড়ীর সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখলেন কথা বলতে গেলেই নজরুলের জিভ কেমন জড়িয়ে আসছে, গান গাইতে পারছেন না। নজরুল টোটকা চিকিৎসায় সব ঠিক হয়ে যাবে বলে বাড়ীর সবাইকে থামিয়ে রাখলেন। কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেল না অনিমেষ, কবির কণ্ঠ-জড়তা বাড়তেই লাগলো আর ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই সন্ধ্যায় বেতারে ছোটদের জন্য গল্প বলতে গিয়ে আর পারলেন না নজরুল, তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখছেন, 'নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে তখনই ঘোষণা করে দিল যে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রোগ্রামটি আর একদিন হবে। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যাওয়ার সেদিনই ছিল নজরুলের শেষ দিন। এদিকে বাড়ীতে প্রমীলা ও গিরিবালা দেবী রেডিওর কাছেই অপেক্ষা করছিলেন। নৃপেনের ঘোষণা শুনেই তাঁরা কাঁদতে লাগলেন এবং বুঝলেন সর্বনাশ হয়ে গেছে।' বাকশক্তি হারালেও বোধশক্তি তখনো হারান নি তিনি, সেই অবস্থাতেই পরের দিন কয়েকটি চিঠিতে বন্ধুদের এই অবস্থার কথা কাঁপা কাঁপা হাতে লিখলেন, সাতদিন পর লিখলেন জুলফকার হায়দার সাহেবকে

আরেকটি চিঠি। না অনিমেষ, কেউ প্রাণভরা ভালবাসা আর যন্ত্রণা নিয়ে ছুটে আসার সময় পায়নি, বসন্তের কোকিলরা আসে না কখনো। দু'একজন দরদী বন্ধু ছাড়া বাকরুদ্ধ সর্বস্বহারা নজরুলের কাছে আসবেন, অর্থ সাহায্য করবেন এমন বোকা তাঁর বন্ধুরা ছিলেন না। নজরুল কাঁপা কাঁপা হাতে লিখলেন এক চিঠিতে, 'এখন আমি ভিখারীর মত।…কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে অতিকষ্টে দু'একটা কথা বলতে পারি। বললে যন্ত্রণা সর্বশরীরে।' আর আরো কয়েকদিন পরে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটল। ভাতের থালার ওপর রাগ, রাগ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ওপর। সব কিছু টান মেরে ফেলে দেন, মুখে অদ্ভুত এক শব্দ করে নালিশ জানাতে চান যেন কারও কাছে। কাগজে কাগজে সংবাদ হল। তবুও সাড়া নেই, যেন আগ্নেয়গিরির মৌনতা দেখে স্বার্থান্বেষী মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, যেন নজরুল ইসলাম দেশ ও জাতির কেউ ছিলেন না! তাঁর শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসাবাড়ীতে হতভম্ব গিরিবালা, অবোধ সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ, আর রোগশয্যায় প্রমীলা—অন্যপ্রান্তে নজরুল—অবস্থাটা কল্পনা করেও শিউরে উঠবে।

শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সভাপতিত্বে 'নজরুল নিরাময় কমিটি' গঠিত হোল বেশ কয়েকমাস পর ১৯৪৩ সালে। সম্পাদক হোলেন সজনীকান্ত দাস ও জুলফকার হায়দার সাহেব। সদস্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদারসহ আরো অনেকে। শ্যামাপ্রসাদ ব্যক্তিগতভাবে পাঁচশো টাকা দিয়ে এলেন নজরুলের হাতে। কমিটি থেকে মাত্র মাসিক দেড়শো টাকা সাহায্যের কথা স্থির হল। অথচ ইচ্ছে করলে এই কমিটির সদস্যরা ঘুরে ঘুরে অনেক টাকা তুলতে পারতেন, দেশবাসীর প্রত্যেকে যদি একটি করেও টাকা দিত সেদিন, তাহলে এই দুর্গতি হোত না। প্রয়াত কবির নামে জন্মোৎসবে আজ দেশের চারিদিকে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়, মঞ্চে নজরুল সাহিত্য কীর্তি নিয়ে আলোচনা হয়, তাঁর অমর গান পরিবেশিত হয়, কিন্তু সেই ভয়াবহ মুহূর্তে কিছু করা হল না।

হাওয়া বদলের জন্য কবিকে সপরিবারে পাঠানো হল মধুপুর।

দু'মাস পরে তিনি যখন ফিরলেন, তখন তিনি বদ্ধ উন্মদা। কলকাতায় এনে কোনরকমে ধরে তাঁকে পাঠানো হল লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে। কারাগারের লৌহকপাট, বন্দীর শৃঙ্খল যিনি ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন একদা, তাঁর পায়ে শিকল বেঁধে বন্দী করে রাখা হল সেখানে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তখন তাঁর নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছেন, চিকিৎসার পরামর্শ দিচ্ছেন, মাঝে মধ্যে সাহায্য করছেন। দেখতে দেখতে তিনচার মাস পার হয়ে গেল, উন্মত্ততা কমলেও কেমন যেন মৌনতা, ডাগর দু'টি চোখে কিসের যেন অনুসন্ধান আর এরই মধ্যে কেউ কেউ বলতে সুরু করলো গিরিবালা দেবীর অযত্নে কবির এই অবস্থা, তাঁর নামে লোকে টাকা সরিয়ে রাখারও অপবাদ দিল।

সাক্ষাত ভগবতীর মত মহিমময়ী জননী গিরিবালা এই অপবাদ সহ্য করতে পারলেন না, ১৯৪৮ সালের ১০ই মে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে একবস্ত্রে তিনি চলে গেলেন অজানার উদ্দেশ্যে, আর তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না কোথাও। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় গিরিবালা দেবীকে দেবীর আসন দিয়েছেন। দুর্ভাগ্য আমাদের এই রক্ষণশীল সমাজের, তারা জাত দেখলেন, পাত দেখলেন কিন্তু স্নেহ মমতা ভালবাসার গঙ্গায় স্নান করতে পারলেন না, মহামানবের মহামিলনের সাগরতীর্থে মন ভেজাতে পারলেন না।

তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। শত শহীদের রক্তস্নানে স্বদেশ জননী শৃঙ্খল মুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন। দিকে দিকে এই স্বাধীনতাকে ঘিরে উৎসব, নেতৃত্বের লড়াই, কার কত ত্যাগ সে নিয়ে বিস্তর গবেষণা। দ্বিখণ্ড ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে তখন নানান চিন্তাশীলের ভীড়, সেখানে কোথায় কোন্ কবি অসুস্থ, সে সব ভাবার মত কেউ ছিলেন না। দুঃখ কোরো না অনিমেষ, লজ্জা পেয়ো না, এই তো আমাদের চরিত্র, দর্পণে তাই না নিজেদের মুখ দেখতে আমরা ভয় পাই, মুখোস খুলে যাবার ভয়ে সরে থাকি অন্ধকারে।

তবু এরই মধ্যে অনেক চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবি নজরুল ইসলামকে দু'শ টাকার মাসিক সাহিত্যিক বৃত্তি মঞ্জুর করলেন।

মুজফ্ফর আহম্দ লিখেছেন, 'তাতেই নজরুলের পরিবার তখনকার মতো ধ্বংসের হাত হতে বেঁচে গেলেন। এত বেশী টাকার সাহিত্যিক বৃত্তি নজরুলের আগে বাঙলা দেশে অন্ততঃ আর কেউ পান নি।' এই বৃত্তি দেবার পেছনে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অবদান নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য নজির হয়ে থাকবে।

১৯৫২ সালে জুন মাসে নতুন করে গঠিত হোল 'নজরুল নিরাময় সমিতি', সংগৃহীত হোল কিছু অর্থ, ২৫শে জুলাই কবিকে রাঁচী সেন্ট্রাল মেণ্টাল হসপিটালে ভর্তি করা হোল। কিন্তু রোগের মূল কারণ ধরতে পারলেন না চিকিৎসকরা। ১৯৫৩ সালের ১০ই মে সস্ত্রীক কবিকে পাঠানো হোল ইউরোপে। লণ্ডনের ডাক্তার রাসেল ব্রেন, ডাক্তার উইলিয়াম সারগণ্ট, ডাক্তার ম্যাককিস্ক কবির চিকিৎসা সুরু করলেন। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হোল কবির মস্তিষ্কের বুদ্ধিবাহী পুরোভাগ সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। ৭ই ডিসেম্বর সকলের পরামর্শে কবিকে নিয়ে যাওয়া হোল ভিয়েনা। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও এই চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ভিয়েনা গিয়েছিলেন। কলকাতার প্রখ্যাত নিউরো সার্জন ডাক্তার অশোক বাগচীও সেই সময় ভিয়েনায় নজরুলের চিকিৎসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ লণ্ডনের ও ভিয়েনার রিপোর্ট সোভিয়েত দেশেও পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে নাকি কোনও উল্লেখযোগ্য সাড়া মেলে নি।

শেষপর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরিয়ে আনা হোল নজরুলকে, ১৫ই ডিসেম্বর তিনি স্বদেশে ফিরলেন। কবি জানলেন না কিছুই, বুঝতেও পারলেন না কোথায় গিয়েছিলেন আর কেনই বা গিয়েছিলেন কিন্তু বাসায় ফিরে চেনা জিনিষপত্র দেখে শিশুর মত উৎফুল্ল হয়ে অবোধ্য ভাষায় হয় তো বলতে চেয়েছিলেন—ফিরেছি তোমার কোলে স্বদেশজননী।

নির্বাক নজরুল জানতেও পারলেন না ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক' দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালের ২৪শে মে যুক্তফ্রণ্ট সরকার তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেখালেন আনুষ্ঠানিক ভাবে, তাও বুঝতে পারলেন না। নির্বাক কবিকে ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র

ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট সম্মানে ভূষিত করলেন। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কবিকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করলেন। ১৯৬৮তে কলকাতা পুরসভা কবিকে দিলেন নাগরিক সম্বর্ধনা। এর সবই অর্থহীন নির্বাক বেদনায় কবি গ্রহণ করলেন কিন্তু বুঝলেন না কিছুই।

১৯৬২ সালের ১০ই জুন দীর্ঘকাল রোগভোগের পর অনন্তলোকে চলে গেলেন প্রমীলা দেবী। মুজফ্‌ফর আহমদ চেয়েছিলেন তাঁর মরদেহ হিন্দুমতে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দাহ করা হোক, কিন্তু প্রমীলার শেষ ইচ্ছা ছিল চুরুলিয়ায় যেন তাঁকে কবর দেওয়া হয়। তাই কবি ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী মজাহার হোসেন, আবদুস সালাম প্রভৃতি সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ, হিতাকাঙ্খী ও মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে পরামর্শ করে ট্রাকযোগে মরদেহ নিয়ে এলেন চুরুলিয়ায়, সেখানে পূর্ণ মর্যাদায় প্রমীলার কবর দেওয়া হোল। আর প্রমীলার আদরের কবি, দোলন চাঁপার ভালবাসার কবি নজরুল উদাস নির্বাক, নির্বোধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন শুধ্। তবু কি আশ্চর্য্য অনিমেষ, অন্তরের গভীরে হয়তো তিনি কাঁদছিলেন, তা না হলে সেদিন আমরা কবিকে অত বিচলিত দেখেছিলাম কেন, তাঁর চোখে জল দেখেছিলাম কেন?

১৯৭২ সালে ২৪শে মে স্বাধীন বাংলা দেশের কর্ণধার শেখ মুজিবর রহমান সসম্মানে কবিকে নিয়ে গেলেন ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি করে। তারপর বাংলাদেশে অনেক ঝড় বয়ে গেল। মুজিবর নিহত হোলেন, সরকার বদল হোল। কবিকে কোনমতেই আর এ দেশে ফেরৎ আনা সম্ভব হোল না। ১৩৮২ ফাল্গুন, ইংরাজী ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কবিকে দিলেন সে দেশের নাগরিকত্ব, শহীদ দিবসকে স্মরণ রেখে একুশে স্বর্ণপদক, নগদ পাঁচ হাজার টাকা। আর এক সপ্তাহ পরেই ২৫ শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ সরকার কবিকে ঘোষণা করলেন তাঁদের 'জাতীয় কবি' বলে।

এরই মধ্যে আরও একজন চলে গেলেন মায়ার সকল বন্ধন কাটিয়ে। কবিপুত্র অনিরুদ্ধ, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীটারশিল্পী,—সংগীতশিল্পী কল্যাণী কাজীর স্বামী, চলে গেলেন সকলকে কাঁদিয়ে। ১৯৭৫ সালের

২২শে ফেব্রুয়ারী তার দেহান্ত হোল, সমাধিস্থ করা হোল গোবরা সমাধিক্ষেত্রে। কবির আদরের নিনি চলে গেল। কবি জানলেন না আর চোখের জলে একা একা অতল দুঃখসাগরের পারে দাঁড়িয়ে অগ্রজ সব্যসাচী সেদিন হয়তো বলেছিলেন—

বিদায় বেদনা বিজড়িত এই সেদিনের সেই স্মৃতি
না মুছিতে হায় পুনঃ জেগে ওঠে—জেগে জেগে ওঠে নিতি।
মুরছি মুরছি সেই মূর্চ্ছনা—বিনায়ে করুণ সুরে
হৃদি নিঙারিয়া রক্ত অশ্রু বক্ষ বহিয়া ঝরে।···

এলো সেই যন্ত্রণাবহ দিন। ১৯৪২ থেকে ১৯৭৬ পর্য্যন্ত দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের মূকযন্ত্রণার চিরবিদায়ের লগ্ন এলো অনিবার্য্য পদক্ষেপে, 'যেতে নাহি দিব' ক্রন্দনের পরোয়া না রেখে—এলো কবির 'চরণ-স্মরণ চিহ্ন' মুছে দিতে। ইংরাজী ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগষ্ট বঙ্গাব্দ ১৩৮৩, ১২ই ভাদ্র, সকাল ৯ টা ১০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় ৯টা ৪০ মিনিট) সাতাত্তর বছর বয়সে ঢাকা পি. জি. হাসপাতালে তাঁর মহাপ্রয়াণ হোল। জানাজা নামাজে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সায়েম, মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জিয়াউর রহমান এবং আরো অনেকে। রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় একুশবার তোপধ্বনি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হোল। বাংলাদেশ বেতারে বিলম্বে একথা ঘোষিত হবার পর সারা দেশ শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সেদিন। সংবাদ পেয়েই কবিপুত্র সব্যসাচী, কল্যাণী কাজী প্রভৃতি যখন বাংলাদেশে পৌঁছালেন, তখন সব শেষ। চোখের জলে ভিজতে ভিজতে পিতৃহারা কাজী সব্যসাচী অশান্ত বুকের যন্ত্রণা চেপে রেখে একমুঠো কবরের মাটি নিয়ে ফিরে এলেন চুরুলিয়ায়, কাঁদতে কাঁদতে গভীর মর্য্যাদায় সকলে সেই পবিত্র মাটি সমাধিস্থ করলেন প্রমীলা ইসলামের কবরের পাশে।

এ বড় যন্ত্রণা অনিমেষ, বড় যন্ত্রণা এই বুকে। বাংলাদেশ নাকি ছাড় পত্র দিয়েছিলেন কবিকে ফিরিয়ে আনতে, তবু তাঁকে আনা হল না, এই বাংলার অগ্নিতাপস সমাধিস্থ হলেন ওপার বাংলায়। প্রমীলা

চেয়েছিলেন তাঁর সমাধির পাশে কবির সমাধি থাকবে। হোল না, 'মরণেও প্রমীলা বড় অভাগিনী', তাঁর সেই শেষ ইচ্ছাটুকুও অপূর্ণ থেকে গেল। আর তো তুমি তো জানোই ১৯৭৯ এর ২রা মার্চ আমরা হারিয়েছি প্রখ্যাত আবৃত্তিকার সুকণ্ঠ সব্যসাচী—কবির জ্যেষ্ঠপুত্রকে।

আজ নজরুল নেই। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের এই জগৎ থেকে চলে গিয়েছেন অমৃতধামে। সেখানে দুঃখ নেই রোগদাহ নেই, স্বার্থজটিল দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। অগ্নিতাপস নজরুল চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন আমাদের মধ্যে। কেউ কেউ বলেন তিনি নির্দিষ্ট এক যুগের কবি, কারো কাছে তাঁর মূল্য ক্ষণস্থায়ী। তুমিও কি তাই মনে করো অনিমেষ? তুমিও কি ঐ মূঢ়দের দলে নাম লেখাবে? কেউ কেউ বলেন, থাক না আড়ালে তাঁর যা কিছু আজও আছে অপ্রকাশিত, আটকে থাক বস্তাবন্দী হয়ে। নজরুলের সংগীত আর আর আবৃত্তিতে যাঁরা সুনাম কুড়িয়েছেন তাঁদের কেউ কেউ ভাবেন নজরুলের চেয়েও তিনি বড়। তুমিও কি সে কথা বিশ্বাস করবে নাকি প্রতিবাদে প্রতিরোধে গর্জন করে ওঠবে, সোচ্চার কণ্ঠে বলবে তিনি চিরশাশ্বত, চিরকালের বিশ্বজনের কবি। বল অনিমেষ, ঐ সব কুটিল রক্ষণশীলদের সামনে দাঁড়িয়ে বল যতদিন থাকবে বাঙ্গালীর সাহিত্য চেতনা, ততদিন নজরুল থাকবেন বুকের মধ্যে। শোষণ মুক্তির সংগ্রামে যত দিন যাবে তত তিনি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবেন, চুরুলিয়া-আসানসোল পেরিয়ে, কলকাতা-পশ্চিমবাংলা ছাড়িয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলা সেতুবন্ধনকে সুদৃঢ় করতে করতে বিশ্ব চরাচরে যুগ যুগ ধরে থেকে যাবে তাঁর নাম—মানুষের কবি নজরুল ইসলাম।

এসো অনিমেষ, ঐ মহামানবের পাদপীঠদলে আমাদের প্রণাম নিবেদন করে ধন্য হই, ঐক্যবদ্ধ হই।

—০—

পাঁচ

আর একটু বোসো অনিমেষ। সমুদ্র গর্জন শোনো ঐ কান পেতে। পূণ্যভূমি চুরুলিয়ায় লক্ষ মানুষের পদধ্বনি শোনো। আমি ঐতিহাসিক নই। উত্তাল সেই অগ্নিযুগের স্মৃতিবাহী কেউ নই। অজস্র সৌগন্ধে ভরপুর ফুলের আড়ালে আমি শুধু এক অখ্যাত অজ্ঞাত ফুলকুঁড়ি। তব চেষ্টা করেছি যতটুকু জানি বলার, প্রিয় কবিকে শ্রদ্ধা জানাবার। কত ঋণ তাঁর কাছে, কে হিসাব দেবে তার, তবুও বিশাল জলধির পরিধি মাপার চেষ্টা করেছি মাত্র। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো অনিমেষ, যে কথা বলার ছিল বলা হল না বলে, যে কথা বলা গেল না তা বলি নি বলে। জানো অনিমেষ, নজরুলকে অনেকেই স্মৃতিচারণের নামে ছোট করেছেন, পথভ্রষ্ট পথিক বলে চিহ্নিত করেছেন এটা যেমন বুকে লাগে আবার ব্যথা পাই যখন দেখি নজরুল-সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রচারের নামে নজরুলকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীবুদ্ধি মাথা তুলছে আজো। আজ যখন তাঁর প্রয়োজন বড় বেশী করে, আজ যখন দেখি জনারণ্যে আরো বেশী করে তাঁর কথা প্রচারিত হওয়া দরকার, তখন ব্যর্থ সংকীর্ণতায় দু'একজনকে হাঁপাতে দেখে লজ্জা পাই মনে মনে।

অথচ নজরুল চিরকালীন। সর্বজনীন। হিন্দু নন, মুসলমান নন, একক অগ্নিতাপস, আত্মভক্ত কবি, সর্বকালের, বিশ্বজনের কবি। তাই তিনি সারাজীবন ধরে, জ্ঞান থাকার শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সাধনা করেছেন মানবতার, বেদ পুরাণ, গীতা, কোরাণ সব কিছু একাকার সেই সাধনায়। প্রমথনাথ বিশী ঠিকই বলেছিলেন, 'যাঁরা গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন—তাঁরাই জেনেছেন নজরুল আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছেন পঞ্চাশ বছর। আমরা আছি পিছিয়ে।' আমরা হিন্দুরা তাঁকে মুসলমানের কবি বলেছি আর রক্ষণশীল মুসলমানেরা বলেছেন কাফের। অথচ আমরা যখন তাঁর কীর্তন, ভজন কিম্বা শ্যামাসঙ্গীত শুনেছি তখন আনন্দে উত্তাল হয়েছি আর রক্ষণশীল মুসলমানেরা ইসলামী গান, মক্কা মদিনার গান, নবীর গান শুনে

ইনসাল্লা বলেছেন, নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নজরুল জানতেন পরম করুণাময়, আল্লাহ আর নারায়ণ, কালী, দুর্গা সবাই এক, আমরা জেনেও তা বলতে পারি নি।

অথচ কি আশ্চর্য্য অনিমেষ, আজো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে নজরুলের রচনা গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারল না, আজো তাঁর নামে সরকারী স্তরে করবো করছি ভেবেও কোনও পুরস্কার ঘোষণা করা হল না। বর্ধমান জেলায় জন্ম নিলেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুলের নামে কোনও অধ্যাপনার পদ তৈরী করা হল না, কেন্দ্রীয় ভাবে নজরুলের সামগ্রিক রচনাবলী রক্ষা করার বা তাঁর সঙ্গীত ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার কোনও প্রচেষ্টা গৃহীত হল না, কপি রাইটের আওতা থেকে তাঁর গ্রন্থাদিকে মুক্ত করা গেল না। কবি জিয়াদ আলির কথায়, 'সবচেয়ে বিপাকে পড়তে হয় নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীত সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠলে। নজরুল রচনাবলী প্রকাশ না হওয়ার ব্যাপারটা কেউ-ই ক্ষমার চোখে দেখতে অভ্যস্থ নন। বাংলাদেশের গবেষকরা কলকাতা থেকে নজরুলের হারিয়ে যাওয়া লেখা, গানের রেকর্ড ও অজস্র তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন, অথচ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেটা সংরক্ষণের কাজে সংগঠিত উদ্যোগ নিচ্ছেন না, এটাও অনেকের কাছে বিস্ময়ের বিষয়।' সত্যিই তাই, আমরা যখন নজরুলকে নিয়ে এবার একটা কিছু করা দরকার বলে হাই তুলছি, আড়িমুড়ি দিচ্ছি, তখন বাংলাদেশে সরকারী এবং বেসরকারী স্তরে নজরুলকে মাথার মণি করে নিরন্তর গবেষণা চলছে। তাঁর সমস্ত রচনার সংগ্রহ, গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। আর আমাদের দেশে প্রায় ষোলো হাজার টাকা ব্যয় করেও শেষ পর্য্যন্ত নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করা সম্ভব হল না, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'ধূমকেতু'র ফাইল চুরি হল, নজরুলের যাবতীয় বিষয় আশয়, লেখাপত্র অসংরক্ষিত থেকে গেল, কাজের কাজ কিছু করা হল না অথচ আমরা নজরুল প্রেমিক সাজালাম। নজরুলের কথায় বলতে ইচ্ছা করে, 'সখী গো আমায় ধর ধর। মাগো, কত জানে এরা ছল!'

তুমি তো জানো অনিমেষ, ঝড়ের গতিতে নজরুল ছুটে বেড়িয়েছেন একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, মানুষের মনের অন্ধকার ঘুচিয়ে দিতে, জড়তার গ্লানি মুছিয়ে দিতে, ঐক্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দিতে বার বার ছুটে গিয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরে। চুরুলিয়া রাণীগঞ্জ থেকে সুরু হয়েছে তাঁর পদযাত্রা, অধুনা বাংলা দেশের প্রসারিত অঞ্চল জুড়ে আঁকা রয়েছে তাঁর পদচিহ্ন। কলকাতার কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, নর সিং লেন, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট থেকে সুরু করে আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর, ভবানীপুর এলাকার বিভিন্ন আড্ডায় যেমন প্রাণমাতানো কবি সংগীতশিল্পী হিসেবে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিলেন ঠিক সেই রকমই নৈহাটি, শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, বালি, চুঁচুড়া, হুগলী, ত্রিবেণীর ব্যাপক অঞ্চলেও তাঁর যাতায়াত ও প্রীতিমধুর সম্পর্কের ইতিহাস গড়ে উঠেছিল তাঁর অন্তরমহিমায়। আজকের দিনে এমনটি আর কে আছেন যিনি গান গেয়ে আর অনর্গল কবিতা লিখে খুলে দেবেন মনের অর্গল, বুকে টেনে নেবেন একান্ত আপন করে, ছুটবেন দিগ্বিদিক মানবাত্মার জয়গান গেয়ে?

জয়গান গেয়েছেন নজরুল। কখনো মানুষের, কখনো প্রেমের কখনো বা নারীর, কখনো ঈশ্বরের। তাঁর ইসলামী সেই বিখ্যাত গানটির কথা কি ভোলা যাবে অনিমেষ, যেখানে তিনি গেয়েছেন—

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা, আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।...
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিক, ইসলাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।
আমির ফকিরে ভেদ নাই সবে ভাই সব এক সাথী।
আমরা সেই সে জাতি॥...

অথবা সেই জনপ্রিয় গানটি—

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে—
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে।...

আবার পরক্ষণেই তাঁরই কণ্ঠে শোনা গেল দেবীস্তুতি, কালিকাবন্দনা— কি অপরূপ সেই মাতৃস্তোত্র—

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা
পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোক পালিকা
মহাকালী মহা সরস্বতী
মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী
তুমি বেদমাতা, তুমি গায়ত্রী, ষোড়শী কুমারী বালিকা···

কিম্বা সেই প্রাণ আকুল করা শ্যামাসংগীত—

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যা'র হাতে মরণবাঁচন।···

আর অনিমেষ, তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে সেই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর করা গানের কথাগুলি—

শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালা নিশিদিন
শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর ধ্যান
শ্রীকৃষ্ণ বসন, শ্রীকৃষ্ণ ভূষণ
ধরম করম মোর জ্ঞান।···

একটি দু'টি নয়, অজস্র ইসলামী গান, শ্যামাসংগীত, বৈষ্ণবগীতির ডালি সাজিয়েছিলেন নজরুল। রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী গান, সংখ্যায় প্রায় চার হাজার গান লিখে নজরুল চিরকালীন আসনে সমাসীন। শুধু ভক্তিগীতি নয়, অথবা বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ বন্দনাই নয়, একই সঙ্গে তাঁর নানান দেশাত্মবোধক সংগীতেও তিনি অনন্য সাধারণ, অতুলনীয়। যেমন, সেই গানটি—

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ
জামা ধরা, জামা ধরা ! মরণ-ভীতু ! চুপ রহো !
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ
এই দুলালুম বিজয় নিশান, মরতে আছি, মরব শেষ।···

আবার দেশপ্রেমের জলধিতরঙ্গে শোষিত-কণ্ঠে গান শুনেছি আমরা—

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা
এযে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।···

আমরা যারা নজরুলকে যুগের কবি হুজুগের কবি বলে পাশ ফিরে ঘুমোই, তারাও জানি না শুধু ভক্তিগীতি নয়, দেশপ্রেমের গান নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গসংগীতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। শুনবে অনিমেষ তার একটু নমুনা, শোনাই শোনো—

আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিণামে লুচি
আমি ভোজনের লাগি' করি ভজন।
আমি মাল্‌পোর লাগি' তল্পী বাঁধিয়া
এ কল্পলোকে এসেছি মন॥···

কিম্বা সেই বিখ্যাত ব্যঙ্গগীতিটি—

সার্জেণ্ট যবে আর্জেণ্ট মার হাতে করে আসে তাড়ায়ে
না হয়ে ক্রুদ্ধ, পদ প্রবুদ্ধ সম্মুখে দিই বাড়ায়ে।
থাকিতে চরণ, মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা
মরণ-হরণ নিখিল শরণ, শ্রীচরণ ভরসা।···

সর্বত্রই নজরুল অনন্য, অসাধারণ। শিশুসাহিত্যেও তাঁর অবাধ আনাগোনা। সারাজীবন ধরে নিজে ছিলেন শিশুর মতোই দেব-মাধুর্য্যে ভরা, আকাশের মত উদার, সরল প্রাণখোলা হাসিতে ছিল শিশুসুলভ আন্তরিকতা। তাই সেই গল্প বলা শিশুর কথা বলতে পেরেছেন প্রাণ খুলে—

'একদিন না রাজা
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা।
রাণী গেলেন তুলতে কলমী শাক
বাজিয়ে বগল টাকডুমাডুম টাক।
রাজামশাই ফিরে এলেন ঘরে—
হাতীর মত একটা বেড়াল বাচ্চা শিকার করে।'

তাঁর 'খোকার খুসী', পুতুলের বিয়ে', 'নবার নামতা পাঠ', 'প্রভাতী' আরো কত কত কবিতাই তো প্রমাণ করেছে শিশুসাহিত্যেও তিনি অনন্য প্রতিভা, তুলনাহীন ভালবাসার কবি।

তুমি দুঃখ পাবে অনিমেষ, যদি শোনো অ-কবি, অ-গীতিকার নিন্দুকের দল বলে বেড়াত নজরুল ছিলেন পানাসক্ত, নারী-আসক্ত এক উদ্দাম ব্যক্তি। মুঠো মুঠো পান খেতেন বলে যদি পানাসক্ত বলা হয় তাহ'লে আপত্তি করবো না কিন্তু মদ্যপ বললেই প্রতিবাদে গর্জন করে উঠবোই। ১৩৮৪ সালে 'নন্দন' পত্রিকায় নজরুল-গবেষক ডঃ সরোজমোহন মিত্র নজরুলকে মদ্যপ বলেছেন। মুজফ্ফর আহ্মদ বলেছেন, 'নজরুলকে কখনও মদ্যপান করতে দেখি নি।' প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কখনও নজরুলকে ধূমপান বা মদ্যপান করতে দেখি নি। দেখি নি নিষিদ্ধ মহিলাদের গান শেখাতে গিয়ে অমানুষিক আচরণ বা বাক্যপ্রয়োগ করতে।' নজরুলের আরেক সংগ্রামী সাথী মঈনুদ্দীন লিখেছেন, 'আমরা তো দেখেছি, সামান্য সিগারেটের নেশাও তাঁর ছিল না।' আঙ্গুরবালা দেবী লিখেছেন, 'মানুষের প্রতিবাদী মানস তাঁর সৃষ্টিতে ফুটে উঠত। এটাই তাঁর নেশা।... কাজীদাকে নেশাচ্ছন্ন হিসেবে কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না।' নজরুলের প্রিয় ছাত্র ও স্বরলিপিকার মনোরঞ্জন সেন বলেছেন, '...জীবনের শেষ চেতনাশক্তি পর্য্যন্ত কাজীদার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলাম। কোনদিন কাজীদাকে মদ সিগারেট খেতে দেখি নি। (প্রমীলা) বৌদি বলতেন, তোমাদের কাজীদার কোন নেশা নেই। শুধু অনিয়মটাই নেশা।'

আর নারী-আসক্তি? নজরুলের অনুরাগিণীর সংখ্যা তো কম নয় অনিমেষ, তাঁর প্রয়াণের পর আরোও বেড়েছে। চলমান এক অগ্নিতাপসের সান্নিধ্যে ঘুরে বেড়ানোর নেশায় এসেছেন অনেকে। তাঁদের প্রতি স্নেহ আর নির্মল ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তো সে অপরাধে তুমি আমি সবাই অপরাধী। জেনে রেখো অনিমেষ, নজরুল যোগভ্রষ্ট ছিলেন কিন্তু ভ্রষ্টচরিত্র ছিলেন না, কারণ তিনি

জানতেন চরিত্র হারালে সব হারাতে হয়। কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, 'নজরুল জনপ্রিয় হয়েছিলেন—তার মূলে ছিল তাঁর প্রাণ-প্রাচুর্য্যভরা মোহন নবীনতা। সেই নবীনতায় কোনও কালিমা স্পর্শ করে নি কখনও।' আর কবি নিজে বলেছেন, 'নর ভাবে আমি বড় নারী-ঘেঁষা। নারী ভাবে—নারীবিদ্বেষী।' নারী তাঁর কাব্যে চিরকল্যাণময়ী, বরণীয়া কিন্তু ভ্রষ্টা নয়, তাঁর চোখে 'বারাঙ্গনাও জননী তাই অনিমেষ, কবি দ্বিধাহীনকণ্ঠে বলেছেন—

'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুথু ও গায়ে
হয় তো তোমারে স্তন্য দিয়াছে, সীতাসম সতী মায়ে।
নাই হলে সতী, তবু তো তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি,
তোমাদেরই ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি।...'

চলো অনিমেষ, ধীর পায়ে যাই। কত কথা বলা হোল না। তবু তুমি তো শুনেছ আমার এ মর্মবেদনা। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। আমি বিশ্বাস করি অনিমেষ, সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন এই সব স্বার্থবুদ্ধি থাকবে না, শোষণ লুণ্ঠন থাকবে না, মানুষের হাতে হাত রেখে, সূর্যের শপথ বুকে এঁকে আমাদের 'কাঙ্খিত জাতীয় ঐক্য সেদিন আসবেই। নজরুলের মন্ত্রে দীক্ষা নেবার দিন সমাগত, স্বদেশ, আমার মা অপেক্ষা করেছেন সেই নবীন সূর্যোদয়ের জন্যে—এসো অনিমেষ, আমরা সেই প্রিয়লগ্নের পথ সাজিয়ে রাখি আমাদের ত্যাগে, বিশ্বাসে, কর্মে আর দেশপ্রেমে।

প্রাসঙ্গিকী

নজরুলের গ্রন্থপঞ্জী

বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থের নাম ও প্রথম প্রকাশকাল উল্লিখিত হল।

কবিতা

অগ্নিবীণা : ৩রা কার্ত্তিক ১৩২৯, অক্টোবর ১৯২২
দোলন চাঁপা : আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩
বিষের বাঁশী : শ্রাবণ ১৩৩১, আগষ্ট ১৯২৪
ভাঙার গান : ঐ
চিত্তনামা : শ্রাবণ ১৩৩২, আগষ্ট ১৯২৫
পূবের হাওয়া : আশ্বিন ১৩৩২, অক্টোবর ১৯২৫
ছায়ানট : আনুমানিক আশ্বিন ১৩৩২, অক্টোবর ১৯২৫
সাম্যবাদী : পৌষ ১৩৩২, ডিসেম্বর ১৯২৫
সর্ব্বহারা : আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬
ফণি মনসা : শ্রাবণ ১৩৩৪, আগষ্ট ১৯২৭
সিন্ধু-হিল্লোল : ১৩৩৪, ইং ১৯২৭
জিঞ্জির : আশ্বিন ১৩৩৫, অক্টোবর ১৯২৮
সঞ্চিতা : (সঙ্কলন) প্রায় ঐ সময়ে
সন্ধ্যা : শ্রাবণ ১৩৩৬, আগষ্ট ১৯২৯
চক্রবাক : ভাদ্র ১৩৩৬, আগষ্ট ১৯২৯
প্রলয় শিখা : ১৩৩৭, ইং ১৯৩০
নির্ঝর : ১৩৪৫, ইং ১৯৩৮
নতুন চাঁদ : চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫
মরু ভাস্কর : ১৩৬৪, ইং ১৯৫৭
সওগাত : ১৩৬৫, ইং ১৯৫৮
ঝড় : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, ইং ১৯৬০
নমস্কার : ১৯২৫—পুলিস এর পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করেছিল।

কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ঃ আষাঢ় ১৩৩৭, জুলাই ১৯৩০
কাব্য আমপারা ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, জুন ১৯৩৩
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৮

ছোটদের কবিতা

ঝিঙে ফুল ঃ আনুমানিক আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬
সঞ্চয়ন ঃ ১৩৬২, ইং ১৯৫৫
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে ঃ ১৩৭০, নভেম্বর ১৯৬৩
সাত ভাই চম্পা ঃ ১৩৭১, জুন-জুলাই ১৯৬৪
ঘুম জাগানো পাখী ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৭১, নভেম্বর ১৯৬৪
ঘুম পাড়ানী মাসি-পিসি ঃ শ্রাবণ ১৩৭২, ইং ১৯৬৫
ফুলে ও ফসলে ঃ ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯, ২৬ মে ১৯৮২
ভোরের পাখী ঃ ঐ
তরুণের অভিযান ঃ ঐ
সাত ভাই চম্পা ঃ ঐ
মটুকু মাইতি ঃ ঐ
জাগো সুন্দর চির কিশোর ঃ ঐ
নজরুল কিশোর সমগ্র ঃ ঐ

উপন্যাস

বাঁধন-হারা ঃ (পত্রোপন্যাস) শ্রাবণ ১৩৩৪, আগষ্ট ১৯৩৭
মৃত্যু ক্ষুধা ঃ বৈশাখ ১৩৩৭ ইং এপ্রিল ১৯৩০
কুহেলিকা ঃ শ্রাবণ ১৩৩৭ জুলাই ১৯৩০

গল্প

ব্যথার দান ঃ ফাল্গুন ১৩২৮, মার্চ ১৯২২
রিক্তের বেদন ঃ পৌষ ১৩৩১, জানুয়ারী ১৯২৫
শিউলি মালা ঃ কার্ত্তিক ১৩৩৮, অক্টোবর ১৯৩১

নাটক

ঝিলিমিলি : অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, নভেম্বর ১৯৩০
আলেয়া : বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ইং ১৯৩১
মধুমালা : মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারী ১৯৫৯
[আরো ছ'টি নাটক ছিল—পাণ্ডুলিপির সন্ধান নেই]

ছোটদের নাটক

পুতুলের বিয়ে : চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩

প্রবন্ধ

যুগবাণী : কার্তিক ১৩২৯, অক্টোবর ১৯২২। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় ২য় মুদ্রণ ১৩৪৬, ৩য় মুদ্রণ ১৩৬৪
রাজবন্দীর জবানবন্দী : মাঘ ১৩২৯, জানুয়ারী ১৯২৩
রুদ্রমঙ্গল : ১৩৩৩, ইং ১৯২৬
ছুর্দিনের যাত্রী : ভাদ্র ১৩৩৩, সেপ্টেম্বর ১৯২৬
ধূমকেতু : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, জানুয়ারী ১৯৬১

সম্পাদিত পত্রিকা

নবযুগ : ১২ই জুলাই ১৯২০ (সান্ধ্য দৈনিক)
ধূমকেতু : ১২ই আগষ্ট ১৯২২ (অর্ধ সাপ্তাহিক)

পরিচালিত পত্রিকা

দৈনিক সেবক : ১৯২২
লাঙল : ১লা পৌষ ১৩৩২, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫ (সাপ্তাহিক)
গণবাণী : ১২ই আগষ্ট ১৯২৬ ('লাঙলে'র পরিবর্তিত নাম)
নওরোজ : ১৯২৭ (মাসিক পত্রিকা)

সঙ্গীত গ্রন্থাবলী

বুলবুল (১ম খণ্ড) : আশ্বিন ১৩৩৫, অক্টোবর ১৯২৮
চোখের চাতক : অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ডিসেম্বর ১৯২৯

চন্দ্রবিন্দু : ১৩৩৭ ইং ১৯৩০। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর ২য় মুদ্রণ ১৩৫২ ইং ১৯৪৮

নজরুল-গীতিকা : ভাদ্র ১৩৩৭, সেপ্টেম্বর ১৯৩০

সুর সাকী : আষাঢ় ১৩৩৯, জুলাই ১৯৩৯

নজরুল-স্বরলিপি : শ্রাবণ ১৩৩৮, আগষ্ট ১৯৩১

জুলফিকার : ভাদ্র ১৩৩৯, সেপ্টেম্বর ১৯৩২

বন-গীতি : আশ্বিন ১৩৩৯, অক্টোবর ১৯৩২

গুলবাগিচা : আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩

গীতি-শতদল : বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪

সুরলিপি : ভাদ্র ১৩৪১, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

সুরমুকুর : আশ্বিন ১৩৪১ অক্টোবর ১৯৩৪ (স্বরলিপি)

গানের মালা : ঐ

বুলবুল (২য় খণ্ড) : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯, ইং মে ১৯৫২

রাঙাজবা : বৈশাখ ১৩৭৩, ইং এপ্রিল ১৯৬৬

নজরুল গীতি (অখণ্ড) : ৬ই আশ্বিন ১৩৮৫

বিবিধ গ্রন্থাবলী

দেবী স্তুতি : মহালয়া ১৩৭৫, ইং ১৯৬৮

সন্ধ্যা মালতী : শ্রাবণ ১৩৭৭, ইং ১৯৩৫

চিত্র কাহিনী

(১) বিদ্যাপতি (২) সাপুড়ে

রেকর্ড নাটিকা

বিদ্যাপতি :	H. M. V.	N9766-72	সেট নং	১১৯
বিয়েবাড়ী :	,,	N7326-8	,,	৪৩
শ্রীমন্ত :	,,	N7424-6	,,	৭২
পুতুলের বিয়ে ১-২	,,	GT24-29		
ইদলফেতর ১-৪	,,			
প্রীতি উপহার ১-৬	,,			
বনের বেদে	,,			

[নজরুল জেলের মধ্যে অভিনয়ের জন্যে একটি নাটিকা লিখেছিলেন, তাতে অভিনয়ও করেছিলেন। এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি।]

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত গ্রন্থাবলী

(১) বিষের বাঁশী (২) ভাঙ্গার গান (৩) প্রলয়শিখা (৪) চন্দ্রবিন্দু (৫) যুগবাণী (৬) রুদ্রমঙ্গল (৭) নমস্কার (পাণ্ডুলিপি ধ্বংস)।

নজরুল কাব্যের অনুবাদ

নজরুলের অসংখ্য কবিতা ইংরাজী, রুশ, তুর্কী, চীনা, আরবী, হিন্দী, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে ও হচ্ছে এখনও।

রেকর্ড হয়েছে

১৩৫১ সালের চৈত্রমাস থেকে ১৩৫২ সালের আষাঢ় পর্যন্ত নজরুলের ১৫৯৪টি গান রেকর্ড হয়ে বেরিয়েছে। গান প্রকাশিত হয়েছে সাড়ে তিন হাজারের কিছু বেশী। অপ্রকাশিত গানের সংখ্যা আনুমানিক তু'হাজার হবে।

* সূত্র ঃ নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

যে সব গ্রন্থাদি, সংস্থা ও ব্যক্তির সাহায্য নিয়েছি—

(১) নজরুল রচিত বিবিধ কাব্যগ্রন্থ, সংগীত সমগ্র (২) কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (৩) নজরুল-স্মৃতি—সম্পাদনা বিশ্বনাথ দে (৪) কাজী নজরুল—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (৫) নজরুল জীবনচরিত—ডঃ মিলন দত্ত (৬) সৈনিক নজরুল—শিবসনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—সম্পাদনা, কথাসাহিত্য (৮) নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য—শেখ আজিবুল হক (৯) কাজী

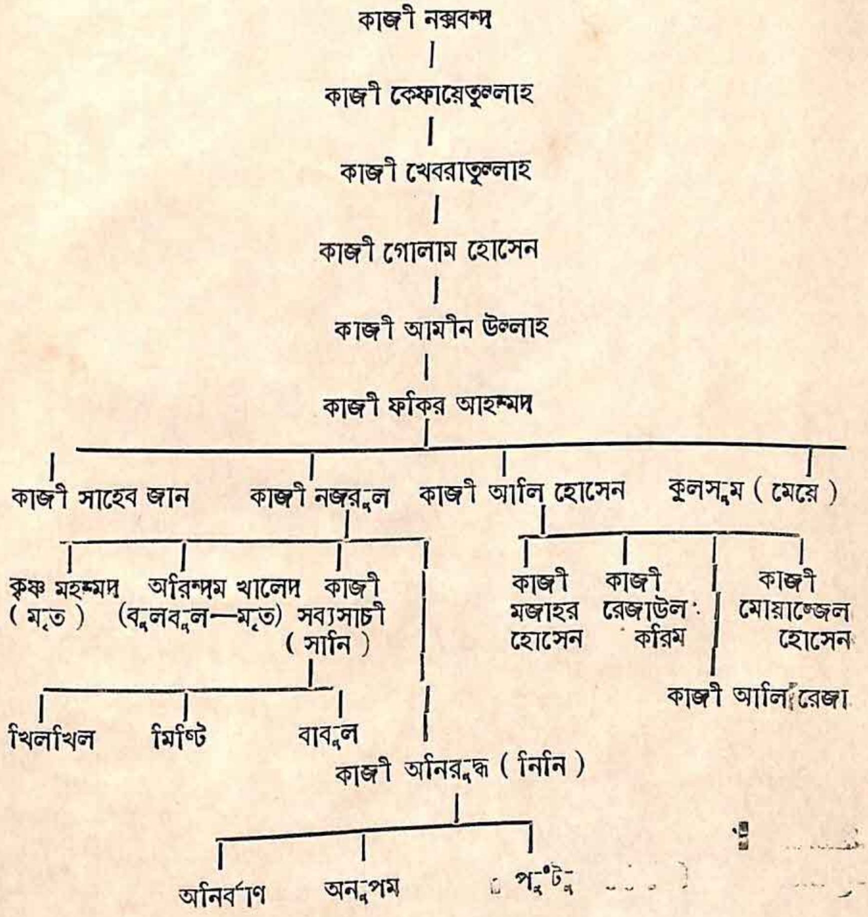
রেজাউল করিম, কবির ভ্রাতুষ্পুত্র ও নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক (১০) কাজী মজাহার হোসেন, কবির ভ্রাতুষ্পুত্র ও নজরুল একাডেমীর সহ-সভাপতি (১১) কবি জিয়াদ আলি (১২) বাদল হাজরা, লাবণ্য পুস্তক বিপণি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (১৩) শিবানী ফটোগ্রাফিকস্, ৩, সূর্য সেন স্ট্রীট (১৪) চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, দোমোহানী বাজার (১৫) বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, কলকাতা (১৬) নজরুল আকাডেমী সম্পাদিত স্মারকপত্রিকাগুচ্ছ।

নজরুল আকাদেমী : কবিতীর্থ চুরুলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত। আগে নাম ছিল নজরুল জন্মতীর্থ কালচারাল এ্যাসোসিয়েসন। ১৯৫৮ সালের ১২ই এপ্রিল এর প্রতিষ্ঠা দিবস। পরে ১৯৬৬ সালের ৪ঠা জুন থেকে এর নাম পাল্টে রাখা হয় নজরুল আকাদেমী। আগে কবির জন্মদিনে তিনদিন ধরে উৎসব হোত, গত কয়েক বছর ধরে ১১ই জ্যৈষ্ঠ থেকে সাতদিন গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়, যোগ দেন এপার বাংলা ওপার বাংলার বহু গুণীজন। প্রতি বৎসর সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে নজরুল আকাদেমীর পক্ষ থেকে গুণীজন সম্বর্ধনা ও নজরুল পুরস্কার দেওয়া হয়। অতি সম্প্রতি আকাদেমীর উদ্যোগে কাজী নজরুল মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সংস্কৃতি বিকাশ ও সাহিত্যচেতনা এবং নজরুল গবেষণা নিয়ে আকাদেমীর ব্যস্ততা সারাবছর ধরেই চলতে থাকে। আকাদেমী ভবনে এখন 'শহর গ্রন্থাগার'টি এই এলাকার গর্ব।

পথ নির্দেশিকা : আসানসোল থেকে বাসে বা মিনি বাসে ভায়া দোমোহানী বাজার ১২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা—নজরুল সরণীর ওপর দিয়ে যেতে হবে। বহিরাগত অতিথিদের জন্য কমঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবনে থাকার ব্যবস্থা আছে—অতিথি নিকেতন করার প্রচেষ্টা চলছে।

—০—

নজরুলের বংশ তালিকা


কাজী নক্সবন্দ
কাজী কেফায়েতুল্লাহ
কাজী খেবরাতুল্লাহ
কাজী গোলাম হোসেন
কাজী আমীন উল্লাহ
কাজী ফকির আহম্মদ
কাজী সাহেব জান
কাজী নজরুল
কাজী আলি হোসেন
কুলসুম (মেয়ে)
কৃষ্ণ মহম্মদ (মৃত)
অরিন্দম খালেদ (বুলবুল—মৃত)
কাজী সব্যসাচী (সানি)
কাজী মজাহর হোসেন
কাজী রেজাউল করিম
কাজী মোয়াজ্জেল হোসেন
কাজী আলি রেজা
খিলখিল
মিষ্টি
বাবুল
কাজী অনিরুদ্ধ (নিনি)
অনির্বাণ
অনুপম
পুটু

